আনন্দময় কর্ম
সুখী জীবন

ডেল কর্নেগী রচিত

HOW TO ENJOY YOUR LIFE AND YOUR JOB

গ্রন্থ অবলম্বনে

ভাষান্তরিত সম্পাদনা

আলোক কুমার সেন

মনোমোহন প্রকাশনী * কোলকাতা তিয়াত্তর

প্রকাশক
প্রবীর ভট্টাচার্য
C/o বুকস ওনলি
৫৪/৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশ কাল
২০শে জুলাই, ১৯৫৯
৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : বরুণ ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

ডেল কর্নেগীর জীবনে যিনি সবচেয়ে
বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন,
সেই মরমী মানবত্রাতা ও দক্ষ প্রশাসক
আব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ডরোথি কারনেগির অভিমত

আমাদের এই সুখ দুঃখ ভরা জীবনের ব্যস্ত প্রহরগুলি অতিবাহিত হয় কর্মের চিন্তায়। তাই আসুন, এই কর্মজীবনকে সুখী আর সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা যাক।

হয়তো আপনি ব্যস্ত আছেন কোন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে, আপনার মুহূর্তের ত্রুটি হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে, হয়তো দিনের শেষে ক্লান্তি এসে ভীড় করে আপনার মনে। আসে হতাশা, আসে চরম শ্রান্তি।

মনে হয়, এ জীবনের ভার বুঝি আর বহন করা সম্ভব নয়।

একটু ছুটির জন্যে মনটা আপনার হাঁপিয়ে ওঠে।

যে মানুষটির রচনা পাঠ করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন, যে মানুষটি তাঁর নিজের জীবনের অনন্ত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সমুদ্রে ডুব দিয়ে পাকা ডুবুরির মত সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতার রত্ন, সেই ডেল করনেগির এই বইখানি নিঃসন্দেহে আপনার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে আলোর সন্ধান দেবে।

আসুন, সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে এখনি ডেল কারনেগির পথে চলতে শুরু করুন। দেখবেন, জীবন আপনাকে দেবে হাজার হাজার আনন্দের রোশনাই। পাখীর কাকলি সূর্যের কিরণ চন্দ্রের জ্যোৎস্না অথবা মানুষের সান্নিধ্য থেকে আপনি বেঁচে থাকার নিত্য নতুন উপকরণ লাভ করবেন।

আপনার কর্ম আনন্দময় হয়ে উঠুক আর জীবনে সুখের ছোঁয়া লাগুক এইটুকুই—আমার আন্তরিক কামনা।

এ বই আপনি কেন পড়বেন * এ বই আপনার কি উপকার করবে

নিজেকে খুঁজুন। নিজেকে অন্বেষণ করুন। মনে রাখবেন পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই।

* * *

অনুসরণ নয়। অনুকরণ নয় নিজেকে জানুন, নিজের পথে চলুন।

* * *

সুন্দর কাজের চারটি উপায়—

টেবিল পরিষ্কার রাখুন। হাতের কাছে যে সমস্যা আছে তা ছাড়া অন্য সব কাগজ সরিয়ে ফেলুন।

* * *

সুন্দর কাজের দ্বীতিয় উপায়—

গুরুত্ব অনুসারে কাজ করুন।

* * *

সুন্দর কাজের তৃতীয় উপায়—

যখনই কোন সমস্যার মুখোমুখী হবেন সঙ্গে সঙ্গে সেটি সমাধানের চেষ্টা করুণ। হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

* * *

সুন্দর কাজের চতুর্থ উপায়—

সংগঠন, শৃঙ্খলা আর নিয়ন্ত্রণ। যা আপনাকে ক্লান্ত করে তা থেকে বাঁচার উপায়।

* * *

ক্লান্তি, বিরক্তি, নৈরাশ্য আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায়।

প্রিয়তমা তরুণীর সঙ্গে দশ মাইল হেঁটে গেলেও ক্লান্ত হবেন না
অথচ বিরক্তিকর স্ত্রীর সঙ্গে দশ পা হাঁটতেও কষ্ট হবে !
এর কারণ কি ?

* * *

আপনার যা আছে (!) তার দাম লক্ষ্য টাকা

* * *

সমালোচনার প্রশ্রয় দেবেন না।
অকারণ সমালোচনা ক্ষতি ডেকে আনে।
অকারণ সমালোচনা হল ছদ্মবেশী প্রশংসা।

* * *

এই শব্দ কটি মনে রাখবেন—কাজের মধ্যে ফাঁকি দেবেন না।
আত্মরক্ষার ছাতাটি খোলা রাখুন, যাতে সমালোচনার বৃষ্টিধারা
আপনাকে ভিজিয়ে না দেয়।

* * *

মধু আহরণে ব্যর্থ হলে মৌচাকের দোষ কি ?
মধু আহরণের সহজতম পন্থা কি ?

* * *

জনসংযোগের কয়েকটি সহজ উপায়।

* * *

কর্মঠ লোকের পায়ের নীচে পৃথিবী।
কর্মহীনকে নির্জন পথে চলতে হয়।

* * *

বন্ধুত্ব লাভের সহজ কয়েকটি উপায়।
দুর্গম পথকে সুগম করার একমাত্র উপায় (?)

* * *

লোকের মন জয় করার সহজ উপায়।

"প্রথম অধ্যায়"

"নিজেকে খুঁজুন। নিজেকে অন্বেষণ করুণ, মনে রাখবেন, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই।"

দক্ষিন ক্যারোলিনা থেকে জনৈকা শ্রীমতী আমাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। তাতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সমস্যার কথা বলেছেন।

সেই চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম—ছোটবেলায় আমি ছিলাম অত্যন্ত সংবেদনশীল আর লাজুক স্বভাবের। আমাকে প্রায়ই রাগানো হত। আমার প্রবীণা মা সব সময় বলতেন যে সুন্দর পোষাক মানুষকে বোকা আর অহংকারী করে দেয়। তাঁর মত ছিল নিজেকে সাজিও না।

শ্রীমতীর কথা বলার আগে, আসুন, এবার আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে আর একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনাই। যা শুনলে হয়তো আপনি আপনার নিজস্ব সমস্যা সমাধানের একটা পথ পেয়ে যাবেন।

হলিউডের এক বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল নবাগত অভিনেতাদের উৎসাহ দেওয়া, যারা নতুন আসতো তারা সবাই হতে চাইতো দু'নম্বর গ্রেটাগার্বো। কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর গ্যারী কুপার।

পরিচালকের ভাষায়—"দর্শকেরা ইতিমধ্যেই ওঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এখন তাঁরা নতুন কিছু চাইছেন। এমন কিছু যা স্বাদে গন্ধে একেবারে অভিনব হবে।

"ডক্টর জিভাগো" এবং "ফরহুম দ্যা বেল-টোলস" এর মত সুবিখ্যাত চিত্র পরিচালনা করার আগে ঐ ভদ্রলোক কয়েক বছর কাটান এক ব্যবসাতে। যেখানে তাঁর কাজ ছিল বিক্রির পরিমান বাড়ানো। তাঁর মতে ব্যবসার জগতে যে নিয়ম খাটে সে নিয়মটাই চলচ্চিত্র জগতে প্রয়োগ করা যায়। মানুষ তো বাঁদরের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে না। মানুষ কখনো কথা বলা তোতা পাখী হতে পারে না।

উনি বলেছেন—"অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, যে সমস্ত মানুষ যা নয় তাই ভান করে, তাদের বিদায় জানানো উচিত।"

সম্প্রতি আমি সসনি ভ্যাকুয়াম ওয়েল কোম্পানির ডিরেক্টর বিস্টনকে প্রশ্ন করেছিলাম যে চাকুরী প্রার্থীরা আবেদন পত্রে সবচেয়ে বড় কি ভুল করে? তিনি প্রায় ষাট হাজার লোকের ইনটারভিউ নিয়েছেন এবং "চাকরী পাবার ছটি উপায়" নামে একটি বইও লিখেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে ওনার বক্তব্যের গুরুত্ব আছে।

তিনি জবাব দেন—আবেদন করার সময় ওরা মারাত্মক একটা ভুল করে বসে। ওরা আগে থেকেই ভাবে যে আমরা কি ধরনের প্রশ্ন করতে পারি। কিন্তু অতিরিক্ত চালাক চতুরকে কেউ পছন্দ করে না। আসলে আমরা তো অচল পয়সাকে চালাতে পারি না।

এবার শুনুন ক্যারোলিনার সেই মহিলার কথা……

আমি কখনো পার্টিতে যেতাম না, আনন্দ পেতাম না, যখন আমি বিদ্যালয়ে গেলাম তখন আমাকে বাইরে যেতে দেওয়া হত না। অন্য সকলের চেয়ে আমি ছিলাম আলাদা, মুখচোরা ও একগুঁয়ে।

……বড় হবার পর আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় এক পুরুষকে আমি বিয়ে করি। কিন্তু আমার স্বভাব বদলাল না। আমার ননদিনীরা ছিল আধুনিকা, আমি তাদের সঙ্গে মিলে মিশে চলবার আপ্রাণ চেষ্টা করি। সেই চেষ্টা ক্রমশঃ আমাকে দূরে সরিয়ে দিল। আমি হলাম দুর্বল আর বিরক্তি ভরা। বন্ধুদের আমি এড়িয়ে চলতাম। এমনকি গীর্জার ঘণ্টা-ধ্বনি আমাকে ভয় পাওয়াতো।

আমার প্রয়াস ব্যর্থ হল। সব সময় মনে হত আমার স্বামীর চোখে আমি যেন একদিন ধরা পড়ে যাবো। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় নিজেকে সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতাম।

কখনো হতাম অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ, কখনো বা চুপচাপ থাকতাম। এমনভাবে আমার দিনগুলো নিরানন্দেব মধ্যে কেটে গেল।

জীবনের অস্তিত্ব হল অর্থহীন, বেঁচে থাকার কোন মূল্য রইল না। আমি আত্মঘাতিনী হবার কথা ভাবলাম।"

কেন একজন সুখী রমণীর জীবন বিষাদে ছেয়ে গেল ?

শ্রীমতী আরো লিখেছেন—"একটি মন্তব্যে আমার গোটা জীবন বদলে গেল। একদিন আমার শাশুড়ী বলেছিলেন তাঁর কথা। কি ভাবে তিনি ছেলেদের বড় করে তোলেন। কি ঘটেছে তার উপর তিনি জোর দেন নি।

…ঐ মন্তব্য আমাকে উদ্দীপ্ত করল। আমি উপলব্ধি করলাম যে এত দুঃখ কষ্টের উৎস হলাম আমি। যে পরিণতির দিকে আমি এগিয়ে চলেছি তা আমারই অবদান।

রাতারাতি আমি বদলে গেলাম। আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে চিন্তা শুরু হল। নিজের পছন্দ অপছন্দ নিয়ে ভাবতে বসলাম। বন্ধুর সন্ধানে হাত দিলাম বাড়িয়ে। একটা সংগঠনে যোগ দিলাম—প্রথমে সেটা ছিল ছোট্ট সংঘ, তারাই আমাকে নানা অনুষ্ঠানে পাঠাতো। প্রথম প্রথম ভয় লাগতো আমার, তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করলাম। পরবর্তী কালে এই সাহস আমার কাজে লেগেছিল যখন আমি নিজের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করি, তখন তাদের মনের মধ্যে এই সাহসের সঞ্চার করেছিলাম। তিক্ত অভিজ্ঞতা আমায় যে শিক্ষা দিয়েছিল তা থেকে আমি বলতে পারি—যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ করে কি লাভ? ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকাই উচিত।

এক বিশিষ্ট চিকিৎসক এই মন্তব্য করেছেন—নিজেকে অন্বেষণ করার সমস্যাটা হল ইতিহাসের মতই প্রাচীন আর মানব জীবনের মত সার্বজনীন।

সত্যি বলতে কি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এই বোধটি। অ্যানজেলো প্যাটরি এ সম্পর্কে বেশ কয়েকখানি বই লিখেছেন এবং শিশু শিক্ষার বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা

করেছেন। তার মতে—যে ব্যক্তি নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে করে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কারোও নেই।

এক কণ্ডাকটারের মেয়েকে জীবন সংগ্রামে জোর লড়াই করতে হয়েছিল। হতে চেয়েছিল সে গায়িকা, কিন্তু মুখশ্রী তার ভাল ছিল না। ঠোঁট দুটি ছিল পুরু, পেছনের দাঁত উঁচু। যখন সে নিউ জারসি নাইট ক্লাবের হয়ে প্রথম সবার সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করে তখন সে তার উঁচু উঁচু দাঁতগুলো ঢাকবার জন্যে ওপরের ঠোঁট দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল। এমনভাবে সে আকর্ষণ বাড়াবার চেষ্টা করে।

এর ফলে সবার কাছে সে হাসির পাত্রী হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর নেমে আসে ব্যর্থতার অন্ধকার।

তার ভাগ্য ভাল সে নাইট ক্লাবে তার এক ভক্তের সন্ধান পায়। সে বলেছিল—আমি তোমার গান অনেকদিন ধরে শুনে আসছি। কিন্তু তুমি বোধ হয় কিছু একটা লুকোবার চেষ্টা করছ। মনে হচ্ছে তোমার দাঁতগুলো নিয়ে তুমি খুবই চিন্তিত, তাই না?

লোকটির কথায় মেয়েটি বিরক্ত হয়। কিন্তু লোকটি তাতে দমে না। সে বলে—এর জন্যে ভেবো না। উঁচু দাঁত থাকাটা কি কোন অপরাধ? মুখ খোলা রেখে গান কর। যখন শ্রোতারা দেখবে যে তোমার লজ্জা ভেঙ্গে গেছে তখন তারা তোমায় অনেক বেশী ভালোবাসবে। তাছাড়া কে বলতে পারে ঐ কুশ্রী দাঁতগুলোই হয়তো একদিন তোমার সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে।

ক্যস ডালে তার কথা শুনেছিল। ফ্রম দ্যাট টাইম অন, সে শুধু তার দর্শকদের কথাই ভাবতে থাকে। মুখ খোলা রেখে শুরু করে তার গান। অল্পকালের মধ্যেই সে মুভী ও রেডিওর নামী গায়িকাতে পরিণত হয়। আজ অন্য সবাই তাকে অনুকরণ করার চেষ্টায় মেতেছে।

সুখ্যাত জোসেফ হেওয়ার্থ একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষ তাদের সুপ্ত মানসিক শক্তির শতকরা দশভাগকে উন্মোচিত করতে পারে। অর্থাৎ আমরা যা করতে পারি, তার তুলনায়

কিছুই করা হয়ে ওঠেনি। বলা যায়, আমরা অর্ধেক জেগে আছি মাত্র। আমাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার সামান্য এক অংশকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু সেই ঘুম সহজে ভাঙে না।

আপনার আমার মধ্যে এই শক্তি রয়েছে। আসুন, আমরা জেগে উঠি। এখন থেকে যেন একটি মুহূর্ত নষ্ট না হয়। চিন্তার কোন কারণ নেই। মনে রাখবেন আপনি হলেন এ পৃথিবীতে এক নতুন সৃষ্টি। সময়ের শুরু থেকে আজ অবধি ঠিক আপনার মত আর কেউ কখনোও আবির্ভূত হয়নি, ভবিষ্যতে কোন দিন আর কেউ আসবে না।

বংশানুক্রমের (genetics) আধুনিক বিজ্ঞান এই শিক্ষা দিয়েছে যে আপনি হলেন ৪৮টি ক্রোমোজোমের ফলশ্রুতি। যার ২৪ টি এসেছে আপনার বাবার কাছ থেকে এবং বাকী ২৪ টি এসেছে আপনার মায়ের কাছ থেকে। আপনি যা কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করছেন তা এই ৪৮টি ক্রোমোজোমের মধ্যে নিহিত আছে। আবার প্রতিটি ক্রোমোজোমের মধ্যে হাজার হাজার জিন রয়ে গেছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মাত্র জিন একজন মানুষের সমস্ত জীবন ধারা বদলে দিতে পারে।

আমরা কি বলতে পারি না যে আমাদের সৃষ্টি হল এক ভয়ংকর এবং আশ্চর্যজনক পদ্ধতি।

এমন কি আপনার বাবা মার মিলন হবার পরেও জন্মের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা তিন লক্ষ বিলিয়নে মাত্র একবার। তার মানে আপনার তিন লক্ষ বিলিয়ন ভাই বোনের জন্ম হতে পারে যারা সবাই স্বভাবে আপনার চেয়ে অন্য রকম হবে।

এটা কিন্তু খামখেয়ালী কল্পনা নয়, এটা হল এক বিজ্ঞান সম্মত ঘটনা।

এ ব্যাপারে যে আমি এত কথা বলতে পারছি তার কারণ এ সম্পর্কে আমার প্রবল আগ্রহ। তিক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান অর্জন করছি তা থেকেই একথা বলার অধিকার জন্মেছে।

যখন আমি গ্রামের বাড়ী থেকে শহরে প্রথম আসি, তখন আমার স্বপ্ন ছিল অভিনেতা হব। তাই ভর্তি হলাম আমেরিকান ইন্সটিটিউট অফ ভিসুয়াল আর্টসে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল জীবনে নাম কেনার এত সহজ অথচ উজ্জ্বলপন্থা আর একটিও নেই। কেন যে হাজার হাজার মানুষ অভিনেতা হবার জন্য চেষ্টা করে না সেটা ভেবে আমার খুব অবাক লেগেছিল। আমি মন দিয়ে পড়তাম পল রজার্স, ওয়ালটার হ্যামডেন আর গ্রেটা গার্বো মত অভিনেতারা কেমন করে তাদের স্বপ্ন সফল করেছিলেন।

এবার আমি তাঁদের শ্রেষ্ঠতম গুণগুলি অনুসরণ করার চেষ্টায় মেতে উঠি। যাতে নিজেকে ঐ ত্রয়ীর সমাবেশে অসাধারণ করে গড়ে তোলা যায়। কি বোকামি, তাই না? কি অবাস্তব কল্পনা! জীবনের অনেকগুলো বছর আমি অন্যকে অনুকরণ করে কাটিয়ে দিলাম। আমার গ্রাম্য জীবনের মোটা মাথাতে ঐসব অনুকরণ ঢুকবে কিনা সে সম্পর্কে কোন কথাই ভাবলাম না।

এই হতাশা বা অভিজ্ঞতা আমার মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে দেয়। কিন্তু আমি বোধহয় ভাল ছিলাম। কেননা কয়েক বছর বাদে আমি এমন সব বই লিখতে শুরু করি যেগুলোকে পৃথিবীর সেরা বই বলে মনে হতে পারে। অভিনয় করার সময় যে চিন্তা আমার মনের মধ্যে ছিল, বই লেখার সময় সেই চিন্তা এসেই আবার আমাকে বিপথে চালনা করল।

আমি একালে লেখকের ভাবনা ধার করে একটা বইয়ের মধ্যে পুরতে চাইলাম। যে বইতে সব কিছু পাওয়া যাবে। জন সংযোগের ওপর একগাদা বই এনে মেতে রইলাম কি করে তা থেকে আমার পাণ্ডুলিপি তৈরী করা যায়।

অবশেষে সত্যিটা বুঝতে পারলাম। অন্যের চিন্তাধারা আমার কলমে তালগোল পাকিয়ে এমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে যে কোন ব্যবসায়ী কোনদিন তাতে চোখ বোলাবে না। আমি এক বছরের পরিশ্রমকে

জলাঞ্জলি দিলাম ময়লা কাগজের পাত্রে। তারপর মনে মনে বললাম তুমি ডেল কারনেগি, তোমার নিজস্ব ত্রুটি আছে, আছে অসম্পূর্ণতা। তুমি তো অন্য কারোর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারো না।

আমি পাঁচ মেশালি বই লেখার সংকল্প ত্যাগ করে শুরু করলাম অন্য চিন্তা। নিজস্ব অভিজ্ঞতা, আর সিদ্ধান্ত থেকে জন সংযোগের উপর একটা পাঠ্য বই লিখে ফেললাম। আমার মনে হয় এর মধ্যে অনেক কিছুই বলতে পেরেছি। এই প্রসঙ্গে স্যর ওয়ালটার রালফের কথা মনে পড়ছে। উনি ছিলেন অক্সফোর্ডে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তখন একবার মন্তব্য করেন সেক্সপীয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোন বই তো লিখতে পারি না ; তবে আমি আমার মত বই লিখেছি।

নিজেকে খুঁজুন। মনে করুন ইরভিন বার্লিনের সেই অমূল্য উপদেশ যা তিনি দিয়েছিলেন জর্জ গেরসউইনকে। যখন বার্লিন আর গেরেস উইনের মধ্যে প্রথম দেখা হয় তখন বার্লিন ছিলেন বিখ্যাত মানুষ, আর গেরেসউইন টিম প্যাম অ্যালেতে সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে গান লেখার কঠিন সংগ্রামে রত এক যুবক।

গেরেসউইনের ক্ষমতায় অভিভুত বার্লিন তাকে নিজের সঙ্গীত বিভাগের সম্পাদক করে নেন। মাইনে দেন প্রায় তিনগুণ। তারপর বলেন, ছনম্বর বার্লিন হয়ো না। চেষ্টা করলে একদিন তুমি প্রথম শ্রেণীর গেরেসউইন হতে পারবে।

এই কথা শুনে গেরেসউইন নিজেকে পরিচালিত করতে থাকে এবং ভবিষ্যতে পরিণত হয় আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারে।

চার্লি চ্যাপলিন, উইল রজার্স মেরী মার্গারেট ম্যাকব্রাইড, জীনে আট্রি এবং আরো লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ যে সত্যটা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাই আমি এই অধ্যায়ে বলতে চাইছি।

চার্লি চ্যাপলিন যখন রূপোলি পর্দায় প্রথম পা রাখেন তখন পরিচালক তাঁকে সে যুগের এক বিখ্যাত জার্মান কৌতুক শিল্পীকে অনুকরণ

করতে পরামর্শ দেন। চার্লি কিন্তু নিজের মতে চলতে থাকেন এবং পরিণত হন আজকের চার্লিতে।

বব হোপোরোর একই অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। তিনি বছরের পর বছর চলেন অন্যের অনুকরণে। তারপর একদিন বন্ধ দরজা যায় খুলে।

যখন মেরী মার্গারেট ম্যাকব্রাইড আকাশবাণীতে আসেন, তাঁকে এক আইরিশ অভিনেত্রীকে অনুকরণ করতে বলা হয়। কিন্তু এতে তিনি বিফল হন। শুরু হয় মিশৌরীর এক সাধারণ গ্রাম্য বালিকার অভিনয়। এতে তিনি নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় বেতার শিল্পীর সম্মান লাভ করেন।

যখন জীনে আউট্রি তাঁর টেক্সাস ভাষা ত্যাগ করে নিউইয়র্ক শহরের বাসিন্দারের মত পোষাক পরে নিজেকে শহরবাসী বলে জাহির করতে চান, তখন সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। এরপর তিনি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে কাউবয়দের গ্রাম্য সঙ্গীত গাইতে শুরু করেন। আজ সারা পৃথিবী তাঁকে চেনে চলচ্চিত্র ও বেতারের জনপ্রিয় কাউবয় গায়ক রূপে।

আপনি এই পৃথিবীতে এক একক সত্ত্ব। এই উপলব্ধি আপনাকে আনন্দময় করুক। প্রকৃতি আপনাকে যা দিয়েছে তা পরিপূর্ণ করুন। নিজের ক্ষমতার বাইরে পা রাখবেন না। আপনার অভিজ্ঞতার পরিবেশ আর বংশ পরিচয় আপনাকে যা দিয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। ভাল হোক বা খারাপ হোক, আপনার ছোট্ট বাগানটির পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকুন। জীবনের অরকেস্ট্রা-য় মন দিয়ে বাজিয়ে যান আপনার ছোট্ট যন্ত্রখানি।

কবি ডগলাসের ভাষায় বলতে পারি

যদি বিশাল বৃক্ষপাইন না হও
হও উপত্যকার ছোট্ট সে গাছ
যদি ছোট্ট সে গাছ দেয় বাধা

তবে হয়ে যেও এক শান্ত ঝোপ।
যদি ঝোপের মত ঘনত্ব না পাও
মন্দকি নয় ঘাসই হলে,
যদি পদ্ম সম ফুটতে নারো
ফুটো অজানা পুষ্প হয়ে।
সবাই কি আর হয় গো গায়ক,
হতেই হবে নীরব বালক,
যা হও তাতে দুঃখ কি ভাই
থাকে যদি অসীম সাহস।
যদি বৃহৎ হবার লজ্জা আসে,
বেশ তো না হয় ছোটই থেকো,
সূর্য তেজে নাইবা জ্বলো
তারার হাসি বজায় রেখো।

সমস্যা থেকে যে মানসিক ক্ষমতা মুক্তি দেয়, যে শক্তি শান্তি দেয়, তাকে পেতে হলে মনে রাখবেন—**অনুসরন নয়, অনুকরণ নয়, নিজেকে খুঁজুন,, নিজেকে জানুন, নিজের পথে চলুন।**

"দ্বিতীয় অধ্যায়"

সুন্দর কাজের চারটি উপায় যা সমস্যা ও যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেয়।

সুন্দর কাজের প্রথম উপায়—টেবিল পরিষ্কার রাখুন। হাতের কাছে যে সমস্যা আছে তাছাড়া অন্য সব কাগজপত্র সরিয়ে দিন।

সিকাগো ও উত্তর-পশ্চিম রেলপথের প্রেসিডেন্ট বলেছেন—যে মানুষের ডেস্কে কাগজের বাণ্ডিল পড়ে থাকে তার মাথা গুলিয়ে যায়, টেবিল পরিস্কার রাখা হল কার্য ক্ষমতা বাড়াবার প্রধান পন্থা।"

যদি আপনি ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ভবন পরিদর্শনে যান, তাহলে দেখতে পাবেন কবি পোপের লেখা একটি বাক্য ছাদের নীচে ঝুলছে—স্বর্গের প্রথম নীতি শৃঙ্খলা।

ব্যবসার ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা হল প্রথম নিয়ম। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এর দিকে নজর দেয় না। আজেবাজে কাগজের স্তুপে তারা টেবিল বোঝাই করে রাখে। সিকাগোর এক প্রকাশক কথা প্রসঙ্গে আমায় জানান, একদিন তার সেক্রেটারী ডেস্ক পরিষ্কার করার সময় একটি টাইপ রাইটার আবিষ্কার করে। যেটিকে দুবছর ধরে খোঁজা হচ্ছিল।

উত্তরের প্রতীক্ষায় পড়ে থাকা চিঠির গোছা, রিপোর্ট আর মেঝের দিকে তাকালে মাথা যেন ঝিম ঝিম করে। বেড়ে যায় দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা। তাছাড়া এত কাজের চাপ রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়, হৃদপিণ্ডের রোগ সৃষ্টি করে। এমন কি পাকস্থলীতে অসুখ বাধাতে পারে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ মেডিসিনের ডক্টর জোসেফ হাইমার আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসো-সিয়েশনেয় জাতীয় সম্মেলনে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

তার ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল—জৈবিক রোগের উৎসরূপে পারি-পার্শ্বিক অবস্থা।

উনি রুগীর মানসিক অবস্থা নিরীক্ষণে এগারটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। এদের মধ্যে প্রথমটি হল জমে থাকা কাজের বোঝা।

কিন্তু কিভাবে আপনি আপনার ডেস্ক পরিষ্কার করে মানসিক শান্তি লাভ করবেন ?

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডক্টর আইজ্যাক স্মিথের নাম মনে পড়ছে। তিনি একটি সরল সুন্দর পন্থা আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে মানসিক স্থিতি বজায় রাখা যায়। জনসন নামে এক শিল্পপতি ওনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তখন জনসন ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির এবং নানা সমস্যায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

মনোবিজ্ঞানীর ভাষায়—জনসন যখন তাঁর সমস্যার কথা বলতে থাকেন তখন হঠাৎ আমার টেলিফোন বেজে ওঠে। আমি জানতাম কেউ জরুরী প্রয়োজনে আমাকে ডাকছে। তা সত্ত্বেও আমি জনসনের কথার মাঝে রিসিভার তুললাম না। কেননা আমার স্বভাব হল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা।

আবার ফোন বেজে ওঠে। একটু বাদেই আমার এক সহকর্মী এসে একটা রোগীর সম্পর্কে উপদেশ চায়। তার সঙ্গে কথা বলা শেষ হলে আমি আবার জনসনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি এবং তাকে বসিয়ে রাখার জন্য ক্ষমা চেয়ে নি। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে জনসনের মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। সেই সমস্যাজর্জর চোখের চাউনি গেছে মিলিয়ে। সেখানে ফুটে উঠেছে নতুন আশার চিন্তা।

তিনি আমাকে বলেন—ডাক্তার ক্ষমা চাইতে হবে না। গত দশ মিনিটের মধ্যেই আমি অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমি আবার কাজে ফিরতে চাই। নতুন করে জীবনকে শুরু করতে চাই যাবার আগে আমি কি একবার আপনার ডেসকটা দেখতে পারি ?

জনসনের কথায় ডাক্তার ডেস্কের ড্রয়ার খুলে দেখলেন— সব খালি !

জনসন বলেন, অসমাপ্ত কাজগুলো আপনি কোথায় রাখেন ?!

—শেষ করে ফেলি !

—চিঠির বোঝা ?

—উত্তর দি। আমার কথা হল উত্তর ছাড়া কোন চিঠি আমি রাখবো না। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সেক্রেটারীকে জবাব দেবার আদেশ দিই।

দুসপ্তাহ বাদে জনসন ডাক্তারকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ জানান। ইতিমধ্যে তাঁর স্বভাবে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। ডেস্কের ড্রয়ার খুলে তিনি দেখালেন যে জমে থাকা কাজ কিছুই নেই। ছ' সপ্তাহ আগে উনি দুটি অফিসে তিনটি ডেস্ক রাখতেন। আর চিঠির বোঝা ওনাকে বারে বারে বিরক্ত করে না।

তাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে আর কোন চিন্তা নেই জনসনের।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি খুব দামী কথা বলে গেছেন। তাঁর মতে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মানুষের মৃত্যু হয় না, মানুষ মারা যায় বিশৃঙ্খলায় আর দুর্ভাবনায়।

এটা কিন্তু খুব খাঁটী কথা।

সুন্দর কাজের দ্বিতীয় উপায়—গুরুত্ব অনুসারে কাজ করুন।

দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সার্ভিস কোম্পানির জনক ক্লাইভ চেষ্টচারের মতে বেতন যাই হোক না কেন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দুটি দক্ষতা পাওয়া যায় না। এই দুই অমুল্য ক্ষমতা হল যথাক্রমে চিন্তা করার ক্ষমতা আর গুরুত্ব অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা।

এবারে শুনুন এক সফল পুরুষের কাহিনী। যিনি বারো বছরের মধ্যে কলগেট কোম্পানীর ডিরেক্টর হয়েছিলেন। তাঁর বার্ষিক বেতন এক লাখ ডলার এবং তিনি বারো লাখ ডলারের সম্পত্তির মালিক। অল্প বয়েস থেকে তিনি ঐ দুটি বিরল ক্ষমতাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন।

তাঁর ভাষায়—' যতদুর মনে পড়ে ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙতো। কেননা সারাটা দিন আমি আমার কাজে কাটিয়ে দিতে চাইতাম। গুরুত্ব বুঝে কাজ করাটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

আমেরিকায় সবচেয়ে সফল সেলসম্যান বিল রজার আগের দিন রাত্রে পরের দিনের সম্ভাব্য কার্যসুচী তৈরী করে রাখতেন। মনে মনে

তিনি একটা হিসেব করতেন যে আগামী দিন কত টাকার বীমা করাবেন। যদি কোনদিন হিসেবের চেয়ে কম কাজ হত তাহলে বাকীটুকু যোগ করতেন পরের দিনের কাজে। এইভাবে এগিয়ে চলতো তাঁর কার্যধারা।

আমার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে আমরা অনেকেই কিন্তু গুরুত্ব অনুসারে কাজ কবতে পারি না। আর তার ফলেই দেখা দেয় য'ত গণ্ডগোল।

যদি জর্জ বানার্ড শ'য়ের মত লোক আগেব কাজটি আগে না করতেন তাহলে হয়তো তিনি জীবন কাটাতেন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হয়ে। উনি রোজ পাঁচ পাতা করে লিখবেন বলে ঠিক করেন। এমন ভাবে নটি বছর কেটে গেল। নবছরে উনি উনি মাত্র ত্রিশ ডলার অর্জন করলেন। তার মানে রোজ একটি মাত্র পেনি! এতেও কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হন নি।

এমন কি ববিনসন ক্রুশকেও ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করতে হত।

সুন্দর কাজের তৃতীয় উপায়—

যখনই কোন সমস্যার মুখোমুখি হবেন সঙ্গে সঙ্গে সেটি সমাধানের চেষ্টা করুন। হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

আমার এক প্রাক্তন ছাত্র কথায় কথায় বলেছিল সে একবার ইউ এস স্টিলের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সভাতে যায়। সেখানে অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু সমাধান মেলেনি। এর ফলে বোর্ডের মেম্বারদেব কাঁধে গোছা গোছা রিপোর্ট চাপিয়ে দেওয়া হল।

অবশেষে আমার সেই ছাত্রটি বোর্ডকে বোঝায় যাতে তারা এক একবার একটির বেশী সমস্যা সমাধান না করে, এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরজন্যে হয়তো অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হবে। তাহলেও এটা করতেই হবে।

শুধু যে ইউ, এস, ষ্টিলের বোর্ড অফ ডিরেক্টররাই এই সত্যটা মনে রাখবে তাই নয়। এটা আপনার আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সুন্দর কাজের চতুর্থ উপায়—সংগঠন, শৃঙ্খলা আর নিয়ন্ত্রণ।

অনেক ব্যবসায় ঠিকমত দায়িত্ব বণ্টন করতে না পারায় বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। নানাভাবে সে জর্জরিত হয়ে পড়ে। উৎকণ্ঠা, উন্মাদনা, হতাশা আর কাজের চাপ তাকে বিভ্রান্ত করে। অবশ্য দায়িত্ব বহনের ব্যাপারটি বেশ শক্ত। আমার কাছে এটা খুব গোলমেলে বিষয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি ভুল লোকের কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু যতই শক্ত হোক না কেন দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা আর অতিরিক্ত কাজের চাপ দূর করতে হলে কর্তৃপক্ষকে এটা করতেই হবে।

যিনি বিরাট ব্যবসা গড়ে তুলেছেন কিন্তু সংগঠন নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলার নিয়ম নীতি জানে না, তিনি উত্তর পঞ্চাশে মৃত্যুর করাল ছায়ায় ভীত হন। মানসিক চাপ থেকে হৃৎপিণ্ডের অসুখ দেখা দেয়।

উদাহরণ চান? তাহলে স্থানীয় কাগজের শোক বার্তায় চোখ বোলান।

"তৃতীয় অধ্যায়"

যা আপনাকে ক্লান্ত করে তা থেকে বাঁচার উপায়।

শুধু মাত্র মানসিক পরিশ্রম আমাদের ক্লান্ত করতে পারে। কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা সুন্দর একটা গবেষণায় মেতে উঠেন। তাঁরা দেখতে চান যে কতখানি পরিশ্রম করলে মানুষ সত্যি সত্যি শ্রান্ত হয়। কিন্তু ওদের গবেষণায় কয়েকটি মজার তথ্য প্রকাশিত হল।

দেখা গেল যে মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত রক্ত কখনই ক্লান্ত হয় না। যদি আপনি কর্মরত শ্রমিকের শিরা থেকে একবিন্দু রক্ত তুলে নেন তাহলে দেখবেন ওতে আছে ক্লান্তি উৎপাদক টকশিন। কিন্তু কোন এক বিজ্ঞানীর মস্তিস্ক থেকে একবিন্দু রক্ত তুলে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে দিনের শেষেও সেখানে ক্লান্তির টকসিন নেই।

মস্তিস্কের আলোচনায় বলা যায় শুরু থেকে শেষ অবধি তা একই চঞ্চলতায় কাজ করে। অর্থাৎ তা হল ক্লান্তি বিহীন। তাহলে কিসে আপনি পরিশ্রান্ত বোধ করেন?

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে শ্রান্তি হল এক মানসিক ও আবেগধর্মী অনুভূতি। ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জনফোর্ড তাঁর দি সাইকোলজি অফ পাওয়ার গ্রন্থে বলেছেন – যে শ্রান্তি থেকে আমাদের দুর্ভোগ তার বেশীর ভাগ আসে মানসিক উৎস থেকে। শারীরিক ক্লান্তি এক বিরল ব্যাপার।

আমেরিকার সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডক্টর আলফ্রেট ব্রিল আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোন শ্রমিকের ক্লান্তির একশো ভাগ আসে আবেগ থেকে।

এই আবেগের স্বরূপ কি?

আনন্দ? আত্মতুষ্টি? না, কখনই না।

বিরক্তি, হতাশা, উদ্বেগ অথবা দুশ্চিন্তা এইসব আবেগ শ্রমিকের কর্মক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। সে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। তার

দৈনন্দিন কাজের হার যায় কমে এবং সে বাড়ী ফেরে এক বিশ্রী যন্ত্রণা নিয়ে। আমরা যে ক্লান্ত হয়ে যাই তার অন্তরালে আছে স্নায়বিক চাপ।

মেট্রোপলিটন লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এক প্রচার পত্রে জানিয়ে ছিল—শারীরিক পরিশ্রম খুব কম ক্ষেত্রেই মারাত্মক শ্রান্তি আনে। এই শান্তিকে নিদ্রা বা বিশ্রাম দ্বারা জয় করা যায়। কিন্তু আবেগ জড়িত উৎকণ্ঠা থেকে যে ক্লান্তি জন্মায় তা সহজে দূর করা যায় না।

যেখানেই থাকুন না কেন, মনে রাখবেন এখনই হল উপযুক্ত সময় যাতে আপনি নিজেকে পরীক্ষা করতে পারেন। যদি এই বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় যে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, তাহলে আর দেরী করবেন না। আপনি কি চেয়ারে বসে ক্লান্তি অনুভব করেন? নাকি হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় পা দুটি বুঝি চলছে না? মুখের মাংস পেশীতে টান ধরে? এক বৃদ্ধ অলস পুতুলের মত আপনার সমস্ত শরীর কি ক্লান্তিতে ভরে উঠে? তাহলে মনে রাখবেন আপনি স্নায়বিক ক্লান্তির শিকার হয়েছেন।

অত্যধিক পরিশ্রম করার সময় আমরা কেন এই অবাঞ্ছিত চাপের শিকার হই?

সেফার্ডের ভাষায়—আমার মতে সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল... সকলেই ভেবে থাকে শক্ত কাজের জন্য মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

তাই আমরা চিন্তা ভাবনার প্রতি নজর দিতে চাই না। কাজ করার সময় দেহের পেশীকে সবল রাখতে চাই। যদিও মস্তিস্কের কাজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

এখানে একটা আশ্চর্যজনক সত্যি কথা বলে রাখি—লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা একটি পয়সাও খরচ করতে চায় না, তারা কিন্তু মদ খেয়ে মাতলামো করার সময় অজস্র অর্থব্যয় করে।

এই স্নায়বিক শ্রান্তি দূর করার উপায় আছে কি?

বিশ্রাম। কাজ করতে করতে বিশ্রাম নিন।

খুব সোজা? না, ব্যাপারটা আয়ত্ব করতে হয়তো কেটে যাবে সারাটা জীবন। কিন্তু একবার যদি আয়ত্ব করতে পারেন তাহলে জীবনে আপনার বিপ্লব ঘটে যাবে।

এক বিশিষ্ট প্রবন্ধকার বলেছেন—আমেরিকানরা যে অতিরিক্ত চাপ ও মানসিক চিন্তা ভাবনাকে ক্রমশঃ বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছে তার ফল কিন্তু ভাল হবে না।

মানসিক চাপ একটি অভ্যাস, বিশ্রামও একটি অভ্যাস। খারাপ অভ্যাসকে ভেঙে ফেলতে হবে, ভালো অভ্যাস তৈরী করতে হবে।

কিভাবে আপনি বিশ্রাম নেবেন?

মন দিয়ে শুরু করবেন নাকি স্নায়ু দিয়ে? ও দুটোর কোনটারই প্রয়োজন নেই। আপনি শুরু করবেন পেশী দিয়ে।

চেষ্টা করে দেখা যাক। কিভাবে এই পরীক্ষা কাজে লাগানো যায় তাই ভাবছেন তো? আসুন, আপনার চোখ দুটো দিয়ে শুরু করি। এই পরিচ্ছেদটা পড়তে পড়তে যখন শেষ অক্ষরটি পড়বেন তখন চোখ বন্ধ রেখে মনে মনে বলুন—আরেকটু, আরেকটু। ক্লান্তি নয়। ক্লান্তি নয়।

পদ্ধতিটা বার বার করুন। অন্তত এক মিনিট ধরে।

কয়েক সেকেণ্ড পরে মনে হবে চোখের পেশী যেন আপনার অনুগত হয়ে পড়েছে। মনে হবে কোন অদৃশ্য হাত বুঝি আপনার মনের বাধা দূর করে দিচ্ছে। এমন ভাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম নিলে মনটা আপনার আগের মত তাজা হয়ে উঠবে।

দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল ঐ দুটি চোখ। যদি আপনি চোখকে পুরোপুরি বিশ্রাম দিতে পারেন, তাহলে আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তার কথা ভুলে যাবেন। সারা দেহে যতখানি স্নায়বিক শক্তি লাগে তার এক চতুর্থাংশ দখল করে ঐ দুটি চোখ। এই কারণে অনেক লোক চোখের যন্ত্রণায় ভোগে। ভিকিভাম হলেন এক বিখ্যাত লেখিকা। তাঁর শৈশবকালে তিনি এক বৃদ্ধ মানুষের সংস্পর্শে

এসেছিলেন যিনি তাঁকে খুব দামী কয়েকটি বিষয় শিখিয়ে দেন। খেলতে খেলতে তিনি হঠাৎ পড়ে যান, তাঁর হাঁটুতে ছড়ে যায়, কবজি কেটে যায়। বুড়ো লোকটি তাঁকে তুলে বলেন—তুমি যে পড়ে গেলে তার কারণ হল তুমি বিশ্রাম নিতে জান না। এসো, তোমাকে আমি তা শিখিয়ে দিচ্ছি।

লোকটি ছিলেন সার্কাসের ক্লাউন।

বিশ্রাম মানে হল সমস্ত উত্তেজনা আর উদ্যমের নিরসন। চোখের পেশীকে ঘুমতে বলুন, মুখের পেশীকে বলুন স্তব্ধ হতে। মনে মনে উচ্চারণ করুন—আরেকটু······আরও একটু······তারপর বিশ্রাম।

তাহলে আপনি আপনার মুখের মাংস পেশী থেকে প্রবাহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারবেন। নিজেকে ভাবুন ছোট শিশুর মত ভাবনা বিহীন।

এক জনপ্রিয়া নর্তকী আমাকে বলেছিল সে চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়ে নিতে পারে। এটা খুব ভালো জিনিষ। এতে শ্রান্তি দূর করা যায়

আসুন বিশ্রাম নেবার পাঁচটি পদ্ধতির কথা শোনাই—

এক। এ বিষয়ে যে বইগুলো লেখা হয়েছে তার মধ্যে অন্ততঃ গোটা ছয়েক বই পড়ে ফেলার চেষ্টা করুন। পড়ে ফেলুন ডাক্তার ডেভিড হ্যারল্ড কিংসের "রিলিজ ফ্রম নার্ভাস টেনসান্স।" পড়ুন ড্যানিয়েল জোসেলিনের "হোয়াই বী টায়ার্ড।"

তুই। যখন তখন বিশ্রাম নিন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুমন্ত শিশুর মত শুয়ে থাকুন। ভারতবর্ষে যোগীরা যেমন করে, তাদের মত করার চেষ্টা করুন। শীতের রোদ্দুরে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত বেড়াল দেখেছেন? বেড়ালরা কখনও ক্লান্ত হয় না। তাদের স্নায়বিক বিকৃতি দেখা দেয় না। তারা নিদ্রাহীনতায় ভোগে না।

বেড়ালের মত বিশ্রাম নিতে পারলে আপনিও অসুস্থ হবেন না।

তিন। আরামদায়ক অবস্থায় যতটা সম্ভব পরিশ্রম করুন। মনে রাখবেন দেহের পরিশ্রম থেকে মানসিক শ্রান্তি দেখা দেয়।

চার। প্রতিদিন নিজেকে চার পাঁচবার প্রশ্ন করুন—যতটা পরিশ্রম করা দরকার তার চেয়ে বেশী কি আমি খাটছি? অকারণে কি আমার পেশীর শক্তি খরচ হচ্ছে?

পাঁচ—দিনের শেষে নিজেকে আবার প্রশ্ন করুন—আমি কতটা ক্লান্ত হয়েছি? আমার ক্লান্তির কারণ কি? এটা কি শুধুই শারীরিক পরিশ্রম?

নাকি মানসিক দুশ্চিন্তা?

আজ যদি আমেরিকার সমস্ত ব্যবসায়ীরা এটি মেনে চলেন তাহলে তাঁরা স্নায়ুর চাপের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

যে বিরক্তি ক্লান্তি দুশ্চিন্তা আর নৈরাশ্য আনে তাকে নির্বাসন দেওয়া

আমাদের ক্লান্তির অন্যতম কারণ হল একঘেয়েমি। আসুন একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন এটা মার্থা নামে কোন একটি সাধারণ মেয়ের কাহিনী। যে হল আপনার প্রতিবেশিনী। সকাল বিকাল আসতে যেতে হঠাৎ কখন পথে প্রান্তরে তার সঙ্গে দেখা হয়। আপনি জানেন মেয়েটি কোন এক প্রাইভেট ফার্মে ষ্টেনোগ্রাফারের চাকরি করে।

দেখতে তাকে মন্দ নয়। বেশ হাসিখুশী। চটপটে স্বভাবের তরুণী। দেখা হলে মুচকি হেসে কুশল বিনিময় করেন আপনি।

একদিন সে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলো। সে যেন ভীষণ শ্রান্ত। জীবন শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। তার মাথায় দারুণ যন্ত্রণা, কোমরে ভীষণ ব্যথা, সে এত ক্লান্ত যে ডিনারের জন্য অপেক্ষা না করে বিছানায় চলে গেল।

মার্থার মা কত বোঝালেন। মার্থা কিন্তু শুনলো না।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

সে বললো—হ্যালো?

—মার্থা।

—প্রিয়তম বন্ধুর কণ্ঠস্বরে চোখ দুটি নেচে ওঠে তার। নাচের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার বয় ফ্রেণ্ড। তার জীবন শক্তি আবার লাফিয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি গাউন পরে চলে গেল বাইরে। যখন ফিরল তখন ঘড়িতে বাজে রাত তিনটে। এতক্ষণ সে অবিরাম নেচে গেছে।

কি আশ্চর্য এখন সে কিন্তু এতটুকু ক্লান্ত নয়। উল্টে এত বেশি উত্তেজিত যে বাকী রাতটুকু তার ঘুম হল না।

মার্থার গল্প শুনে প্রশ্ন করতে পারেন—সত্যি কি সে ক্লান্ত হয়েছিল?

নাকি এটা তার নিখুঁত অভিনয় ? শুনুন, আটঘণ্টা হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে একটি তরুণী তো পরিশ্রান্ত হবেই। তবে এই ক্লান্তির কারণ আছে। মার্থা তার কাজের প্রতি বিরক্ত হয়েছিল। এমন কি জীবনটা তার কাছে হয়েছিল অর্থহীন।

সে চেয়েছিল মুক্তি, সে চেয়েছিল একটু নীল আকাশ। ঐ টেলিফোন তাকে সেই মুক্তির সন্ধান দিয়েছে।

হাতের কাছে এমন অনেক মার্থা ছড়িয়ে আছে। চোখ কান খোলা রাখলে তার সঙ্গে আপনার সঙ্গে দেখা হবেই কিংবা কে বলতে পারে আপনিও এক মার্থা নন ?

এটা তো সত্যি যে মানসিক আবেগ থেকে যে ক্লান্তি আসে তার পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম থেকে উদ্ভূত ক্লান্তির চেয়ে বেশী। বছর কয়েক আগে, এক বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী মনস্তত্ত্বের ওপর একটি বই লেখেন। সেখানে তিনি কয়েকটি মজার মজার পরীক্ষার কথা বলেছেন। একদল ছাত্রকে তিনি নানা ধরণের প্রশ্ন করেন।

দেখা গেছে ছাত্রদের আকর্ষণ নেই এমন ক্ষেত্রে তারা প্রশ্ন শুনতে শুনতে ক্রমশঃই বিরক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মাথায় যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে. চোখ হয়েছে তন্দ্রাচ্ছন্ন। এমন কি অনেকের পেটেও গোলমাল দেখা দিয়েছে।

ভাবছেন সব শুধু কল্পনা ? না। ছাত্রদের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে রক্তের চাপ আর অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা কমতে থাকে যখন একজন বিরক্তি বোধ করে। আবার কাজের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ ফিরে এলে তার পরিপাক ক্রিয়া ঠিকমত চলতে শুরু করে।

উত্তেজনায় ভরা কোন কিছু করলে আমরা কিন্তু সহজে ক্লান্ত হই না। যেমন ধরুন আমার কথা। সম্প্রতি আমি কানাডিয়ান রকির পার্বত্য অঞ্চলে ছুটি কাটিয়ে এলাম। সেখানে কোরাল ক্রীকের ধারে ধারে কেটে গেছে আমার ব্যস্ত প্রহর নেহাত মাছ ধরার নেশায়।

আমি সারাদিন ছটফটে দুরন্ত শিশুর মত বনে-বনান্তারে ছুটোছুটি করেছি।

এমন কি একঘণ্টা পরিশ্রমের পরেও এতটুকু ক্লান্ত বোধ করিনি? এর কারণ কি? কারণ হল কাজের মধ্যে আমি উন্মাদনার সাধ পেয়েছিলাম। কিন্তু যদি মাছ ধরার ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ না থাকত তাহলে আমি কি সাত হাজার ফুট উঁচুতে বসে এত কাজ করার পর ঠোঁটের কোনে হাঁসি ফোটাতে পারতাম?

পাহাড়ে চড়ার মত শ্রমসাধ্য কাজ করেও আমার এতটুকু ক্লান্তি আসে নি। অনেকেই অভিযোগ করেন একটু কাজে তাঁরা হাঁফিয়ে ওঠেন। এটা আর কিছু নয়, এ হল কাজের প্রতি অনিচ্ছা।

কয়েকদিন আগে মীনা পোলিসের কৃষক ও শ্রমিকদের ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট কথায় কথায় আমায় একটি দামী মন্তব্য করেন। কানাডা সরকার তাঁকে পর্বত আরোহণ প্রশিক্ষণে শিক্ষক করেছিলেন। তিনি সৈন্যদের পাহাড়ে চড়া শেখাতেন। তার বয়স হল ৫৫। তিনি অল্প বয়সী সৈন্যদের নিয়ে অবলীলায় পাহাড়ী চড়াই উৎরাই পার হতেন।

এমন অনেক যায়গা ছিল যেখানে খাড়া পাহাড়ের চূড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে। তিনি দড়ি ধরে সাবধানে বরফের খাঁজে খাঁজে পা রেখে একটু একটু করে উঠতেন।

যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। তা সত্বেও তিনি কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও পরিশ্রান্ত হন নি। ঐ অভিযানে তাঁরা বেশ কটি শৃঙ্গ জয় করেন যার মধ্যে আছে মাইকেলের শৃঙ্গ, উপরাষ্ট্রপতির পাহাড় আর লিটল ইহো উপত্যকার অন্যান্য ছোট খাট চূড়া।

বয়েসে তরুণ ঐসব সৈন্যেরা দু'সপ্তাহের কঠিন প্রশিক্ষণ সেরে ফিরেছে কিন্তু পনের ঘণ্টার খাটা খাটুনিতে তারা একেবারে দমহীন হয়ে পড়তো।

এর কারণ কি? কমাণ্ডোর শিক্ষায় তারা যে সব কাজ করেছে, পাহাড়ে চড়াটা কি তার চেয়েও সহজ?

প্রশ্নটা খুব বোকার মত করে ফেললাম।

আসল ব্যাপারটা কি জানেন? পাহাড়ে চড়ার কাজে ওদের কোন উৎসাহ ছিল না।

তাই যা ঘটার তাই ঘটেছে।

প্রশিক্ষণের শেষে ওদের অনেকে এত বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়তো যে রাতের খাবারের কথা বেমালুম ভুলে যেত।

কিন্তু গাইডরা, বয়স তাদের বার্দ্ধক্য ছুঁই ছুঁই, তারা অত পরিশ্রম করেও ডিনারের টেবিলে বসে প্রাণ খোলা হাসি হাসতে পারতো। এমন কি গভীর রাত অবধি গল্প করতো তারা।

কলম্বিয়ার এক বিজ্ঞানী শ্রান্তি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি একদল যুবককে সাতদিন সাতরাত্রি ঘুমোতে দেন নি। অবশ্য চোখের সামনে মুখরোচক আড্ডার আসর বসেছিল।

এই পরীক্ষা করে ঐ ভদ্রলোক বলেছেন কাজের দক্ষতা কমে যাবার একমাত্র বাস্তব কারণ হল বিরক্তি।

আপনি যদি মানসিক কর্মী হয়ে থাকেন তাহলে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন। যে কাজ আপনি করে থাকেন তা কিন্তু আপনাকে ক্লান্ত করে না। কিন্তু যে কাজ আপনি করেন না তা থেকে আপনার ক্লান্তি আসে। মনে করুন সেই দিনটির কথা। সারাদিন আপনার কাজে মন বসেনি। চিঠির জবাব দিতে পারেন নি। লোকের সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠেনি।

এই ঘটনা আপনাকে যথেষ্ট ক্লান্তি দেবে। কিন্তু পরের দিন সারাক্ষণ কাজ করে যখন আপনি বাড়ী ফিরবেন মনে হবে আপনি যেন তুষার সাদা গার্ডেনিয়া ফুলের মত তাজা।

তাহলে যে শিক্ষা আমরা পেলাম তা থেকে বলতে পারি শ্রান্তির কারন কাজ নয়। দুশ্চিন্তা হতাশা আর বিরক্তি থেকে তা সৃষ্টি হয়।

এই বই লিখতে লিখতে আমি মাইক এ্যাণ্ড্রুর আনন্দে ভরা সঙ্গীত মুখর হাসির নাটক দেখতে যাই। সেখানকার নায়ক বলছে—"যারা

প্রত্যেক কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নেয় তাদের মত সৌভাগ্য শালী আর কেউ নেই।" কথাটা খুব দামী। যখন আপনি কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন তখনই ক্লান্তি এসে ঢোকে।

প্রিয়তমা তরুণীর সঙ্গে দশ মাইল হেঁটে গেলেও কিছুই মনে হবে না। অথচ বিরক্তিকর স্ত্রীর সঙ্গে দশ পা হাঁটতে কত কষ্ট হবে!

তাহলে উপায় কি?

কেমন করে এই মারাত্মক ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

এক স্টেনোগ্রাফারের গল্প বলি। মেয়েটি ওকলাহামার তেল কোম্পানীতে কাজ করতো। প্রতি মাসে কয়েকটি দিন তাকে বিরক্তিকর কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। সে কাগজের উপর ছোট ছোট অক্ষর বসাতো, অংকের যোগ বিয়োগ করতো আর পরিসংখ্যানের দুরূহ নয়ম নীতি নিয়ে মাথা ঘামাত।

মেয়েটি কিন্তু এই কঠিন কাজের মধ্যে আনন্দের উৎস খুজে নেয়। সে তার দৈনন্দিন কর্মপন্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

কিভাবে?

প্রতিদিন সে নিজের সঙ্গে লড়াই করত। সকালে সে যতগুলো ফর্ম ভরতি করতো বিকেলে সেই সংখ্যাটা ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো। দিনের শেষে যোগ করে দেখতো সারাদিনে কতগুলো ফর্ম ভর্ত্তি হয়েছে। পরের দিন এই সংখ্যাটা টপকে যাবার চেষ্টা করতো সে। এরফলে তার অফিসে সেই ফর্ম ভতির ব্যাপারে সে প্রথম স্থান দখল করে।

এতে সে কি পেয়েছিল? প্রশংসা? ধন্যবাদ? চাকরীর উন্নতি? অতিরিক্ত বেতন?

না, এর কোনটিই নয়। সে বিরক্তিকে জয় করেছিল। আর হারিয়েছিল ক্লান্তিকে। তার আকর্ষণ বিহীন কাজকে সে উত্তেজনায় ভরপুর করে রাখে। তাই অলস প্রহরের জন্যে সঞ্চিত হয় অতিরিক্ত আনন্দ।

এ মেয়েটির কাহিনী যে সত্যি সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কেননা তাকে আমি বিয়ে করেছি।

আরেকটি স্টেনোগ্রাফারের গল্প শুনুন। তার নাম মিস সেলি-গোলডেন। সে কাজ করে নিউ ইয়র্কের পার্ক অ্যাভিন্যুয়ের একটি অফিসে। আমার কাছে এক চিঠি লিখে সে তার আশ্চর্য সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে।

আসুন তার চিঠি থেকে কিছুটা পড়ে শোনাই।

আমাদের অফিসে চারজন স্টেনো আছে। আমরা বিভিন্ন অফিসারদের কাছ থেকে বিভিন্ন ডিরেকশান নিয়ে থাকি। একদিন আমার বস বললেন, আমি নাকি অযথা বেশী সময় নিয়ে থাকি। এই মন্তব্যে আমি খুশী হতে পারি নি। কেননা আমার চিঠি সাধারণতঃ নিখুঁত হয়ে থাকে।

পরের দিন থেকে শুরু হল আমার নতুন পন্থা। আমি কাজের সঙ্গে আনন্দকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করলাম। দেখতে দেখতে আমার কাজের উৎকর্ষ অনেক বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে আমি অফিসারদের মনযোগ আকর্ষনে সমর্থ হলাম। তারপর ঘটলো সেই অভাবনীয় ঘটনাটা। এক অফিসার তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী পদের জন্যে আমাকে মনোনীত করলেন।

···তাঁর মতে আমার সবচেয়ে বড় গুণ হল, অতিরিক্ত কাজেও আমি বিরক্তি প্রকাশ করি না। আর এটাইতো একজন কর্মচারীর সবচেয়ে বড় গুণ।

মেয়েটির চিঠি পড়ে মনে পড়ছে অধ্যাপক ভিকটর উইলির কথা। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে "যদি" শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। যদি আমরা সবকাজে শান্তি খুঁজে পাই, যদি বিরক্তির মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই, তাহলেই আমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাব।

কয়েক বছর আগে এডওয়ার্ড নামের এক ভদ্রলোক এমন একটি সিদ্ধান্ত নেন যাতে তার জীবনধারা একেবারে বদলে যায়। তিনি প্লেট ধোওয়ার কাজ করতেন, আর হাই স্কুলে আইসক্রিম পাঠাতেন। অন্য সহকর্মীরা যখন ঠাট্টা ইয়ারকিতে মশগুল থাকতো কিংবা মেয়েদের

নিয়ে রসালো গল্প করতো তখন তিনি ঐসব আকর্ষণহীন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন।

এডওয়ার্ড এক মজার খেলায় মেতে উঠলেন। তিনি আইসক্রীম নিয়ে ঘাটতে ঘাটতে আইসক্রীমের ইতিহাস জানতে উৎসাহী হলেন। কিভাবে তা তৈরী হয়, কি কি মাল মশলা লাগে আর কি কি যন্ত্রপাতি লাগে—এসব জেনে নিতে মোটেই দেরী হল না তাঁর। তারপর তিনি ভর্তি হলেন পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট কলেজে, ফুড টেকনোলজি নিয়ে পড়াশুনা করবেন বলে। কিছুদিন বাদে নিউইয়র্ক কোকো এক্সচেঞ্জ একশো ডলারের একটি পুরস্কার ঘোষণা করে। যে কোকো আর চকলেট ব্যবহারের ওপর সবচেয়ে সুন্দর প্রবন্ধ লিখতে পারবে তাকেই পুরস্কৃত করা হবে।

বলুন তো কে প্রথম পুরস্কার পায় ?

জানি, আপনারা ঠিকই ধরেছেন, সেটি পায় ঐ আইসক্রীমওয়ালা।

চাকরী পাবার কথা চিন্তা না করে উনি ওনার বাড়ীর নীচে এক ব্যাক্তিগত ল্যাবরেটারী খুলে বসেন। কিছুদিন বাদে নতুন আইন গৃহীত হল। এর ফলে দুধের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া আছে তাকে গুনতে হবে। উনি সেই কাজের দায়িত্ব নিলেন। আজ উনি হলেন এক সফল পুরুষ যার অধীনে চৌদ্দটি দুগ্ধ কোম্পানী রয়েছে।

আজ থেকে পঁচিশ বছর বাদে কি ঘটতে পারে? এই মুহূর্তে যারা খাদ্য রসায়নের ব্যবসায় মগ্ন আছেন। তাঁদের অনেকেই অবসর গ্রহন করবেন। অনেকে হয়তো মারা যাবেন। কিন্তু এই অতি উৎসাহী ভদ্রলোক তখনও সমান উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করে যাবেন। শৈশবে তিনি যে সব বন্ধুদের কাছে আইসক্রীম বিক্রি করতেন তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে চাকুরী না পেয়ে নিজের ভাগ্য আর সরকারকে দোষ দিতে দিতে জরার চাপে জীর্ণ হয়ে গেছে।

শ্যাম নামের একটি ছেলে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো। তার কাজ ছিল গনগনে আঁচের সামনে দাঁড়িয়ে নাট বল্টু তৈরী করা। সে

এক কাল্পনিক লড়াইতে নেমে পড়ে। পাশাপাশি যারা কাজ করতো তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো সে, এতে তার কর্মদক্ষতা এত বেড়ে যায় যে ফোরম্যান তাকে উঁচু পদে নিয়োগ করে।

এইভাবে শুরু হল এক সফল মানুষের ইতিহাস।

ত্রিশ বছর বাদে তিনি অটোসাম লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কিন্তু যদি তিনি সামান্য কাজকে আকর্ষণীয় করার মন্ত্র না শিখতেন তাহলে আজও তাকে ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের নীচে দাঁড়িয়ে নাটবল্টু তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো।

আকাশবাণীর খবর নিয়ে গবেষণা করে যিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই ক্যালিংবাথ আমাকে সুন্দর একটি কাহিনী শোনায়।

আজ শুনলে গল্প কথা বলে মনে হবে, আসলে এটি কিন্তু তার জীবনের ইতিহাস। বাইশ বছর বয়স থেকে তিনি বেপরোয়া জীবনে মেতে ওঠেন। তখন তিনি ছোট্ট একটা নৌকো চড়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার দুঃসাহসে মেতে ছিলেন। এর পর বাই-সাইকেলে চড়ে সারা ইংল্যাণ্ড ঘুরে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব হয়ে প্যারিসের বুকে এসে পৌঁছোন।

সঙ্গে ছিল সাধের ক্যামেরা। পাঁচ ডলারে সেটি বন্ধক দিয়ে দি নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকার প্যারিস সংস্করণে একটি বিজ্ঞাপন দেন। তারপর মেশিন বিক্রীর চাকরী পান। সে যুগে এক ধরণের চশমা বিক্রী হত, যা দিয়ে দেখলে দুটি ছবি একরকম মনে হত।

ক্যালিংবাথ এই চশমা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। এর মাধ্যমে অনেক কিছু করা যেতে পারে, প্যারিসের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে উনি প্রচুর চশমা বিক্রী করে ফেলেন। যদিও ফরাসী ভাষায় ওনার বিন্দুমাত্র দক্ষতা ছিল। কিন্তু প্রথম বছর প্রায় পাঁচ হাজার ডলার কমিশন পেয়েছিলেন।

এর কারণ কি ?

আমার প্রশ্নের জবাবে উনি মুখ টিপে বলেন—কাজ করার উৎসাহ। শুধু তাই নয়, প্যারিসের এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে তাঁকে সাহায্য

করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি যে বিশেষজ্ঞ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন তার মূলে ছিল ঘটনাটি।

সেলসম্যান হিসেবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি বিভিন্ন স্বভাবের হাজার হাজার মানুষের সংস্পর্শে আসেন। তার ফলে জীবনকে খুব নিকট থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী কালে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

তিনি তো ফরাসী ভাষা জানতেন না, তাহলে কেমন করে কাজ করতেন।

তার বস তাঁকে নিখুত ফরাসী ভাষায় কিছু সংলাপ লিখে দিতেন। সেটা তিনি মুখস্থ করে নিতেন। তারপর শুরু হত তাঁর অভিযান।

মনে মনে দৃশ্যটা ভাববার চেষ্টা করুন।

প্যারিসের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উনি কলিং বেলে হাত রাখতেই গৃহকর্ত্রী এসে সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে ব্যালিংবাথ স্মৃতির পাতা উল্টে ফরাসী বুলি আওড়ে যেতেন। যেহেতু তিনি আমেরিকান তাই উচ্চারণে টান থাকতো। গৃহকর্ত্রী কোন প্রশ্ন করলে উনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতেন—আমি এক আমেরিকান।

এই বলে নানা দেশের ছবি দেখাতেন তিনি। তারপর টুপী খুলে দেখে নিতেন সংলাপটা ঠিক ঠাক হচ্ছে কিনা। কেননা টুপীর মধ্যে সেটা লেখা থাকতো।

ক্যালিংবাথের ভাব ভঙ্গি দেখে ফরাসী মহিলারা যে হাসি চাপতে পারতো না তা সহজেই বোঝা যায়।

এত উদ্যম তিনি কোথায় পেলেন ?

ক্যালিংবাথ বলেন—রোজ সকালে বেরোতে যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলতাম—ক্যালিংবাথ যদি বাঁচতে চাও তাহলে এ কাজটা তোমাকে করতেই হবে। যদি কাজ করতেই হয় তাহলে সেটাকে ভাল করে করাই উচিত। মনে কর কলিং বেলের শব্দ যেন থিয়েটারের ঘণ্টা আর তুমি হলে এক অভিনেতা। বাকী সবাই দর্শক। এসো, অভিনয়ের মারপ্যাচগুলো দেখাতে শুরু কর।

এমনভাবেই তিনি আকর্ষণ বিহীন বিক্রীর কাজকে আকর্ষণীয় করে গেলেন। আর সেলসম্যানের জীবনে রোমাঞ্চের সংমিশ্রন ঘটালেন।

যখন তাঁকে প্রশ্ন করি—আচ্ছা, আমেরিকার তরুণ সমাজের কাছে আপনার কি পরামর্শ? তখন উনি বলেন—আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি, ওরা যেন রোজ সকালে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেয় যে দিনটাকে আরও কর্মমুখর করে তুলবে। আমরা তো শারীরিক ব্যায়ামের কথা বলে থাকি। কিন্তু আমার মনে হয় কাজ শুরু করার আগে মানসিক ও আত্মিক প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

কথাটা শুনে অবাক হচ্ছেন? মনস্তত্ব কিন্তু বলেছে—আমাদের জীবন হল চিন্তার প্রতিফলন, আজ থেকে দুহাজার বছর আগে মার্কাস আউরেলিয়াম তাঁর মেডিটোরিয়ান্স গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—আমাদের জীবন হল ভাবনার প্রতিবিম্ব।

—আসুন, কাজ শুরু করার আগে অঙ্গীকার করুন—বিরক্তিকে নির্বাসন দিতে হবে; আগামী জীবনকে সুন্দর আর সার্থক করে তুলতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

আপনার যা আছে তার দাম লক্ষ ডলার

আমার সঙ্গে হ্যারল্ড ডিসিমের আলাপ অনেক দিনের। উনি ক্যামকাস সিটির ২৭৫, সাউথ প্যাসিফিক অ্যাভিন্যুর-বাসিন্দা। উনি হলেন আমার লেকচার ম্যানেজার। একদিন হ্যারল্ড আমাকে মিশৌরী থেকে গাড়ীতে করে বেলটন শহরে নিয়ে যান। যেতে যেতে কথা হচ্ছিল।

উনি বলেন—সেটা ১৯৩৬ সালের কথা। সময়টা ছিল বসন্ত কাল। আমি ওয়েভ সিটির ওয়েষ্ট ষ্ট্রিট ধরে আনমনে হাঁটছিলাম। পথে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাই যা আমার সমস্ত দুর্ভাবনাকে ধ্বংস করেছিল।

…ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগে মাত্র দশ সেকেণ্ড। কিন্তু ঐ দশ সেকেণ্ডে আমি যা শিখেছিলাম তা আমার পূর্ববর্তী দশ বছরের অভিজ্ঞতাকে অনায়াসে সারিয়ে দিতে পারে, দেখলাম, একটি লোক চাকা লাগানো কাঠের গাড়ীতে আসছে, তার হাত নেই, পা নেই। তার হাতে রয়েছে কাঠের যন্ত্র। সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো—সুপ্রভাত, আজ সকালটা দারুন, তাই না?

…আমি তখন মার্চেণ্টস ব্যাঙ্কে চলেছি। আগের শনিবার আমার ছোট মুদির দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। ফুরিয়ে গেছে সমস্ত সঞ্চয়, এমন কি যা দেনা করেছি সেটা শেষ করতে আরও বছর সাতেক লেগে যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা ধার করে ক্যামকাসসিটিতে চাকরী খুঁজতে যাব।

…সেই হাত পা বিহীন পঙ্গু লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমি নিজেকে ভীষণ ধনী বলে মনে করলাম। সত্যিই তো আমার যা আছে তাই বা কম কি? আমার দুটি পা আছে, আমি যেখানে সেখানে হাঁটতে পারি। দুটি হাত আছে, যা খুশী লিখতে পারি। মনে মনে আমি ভাবলাম, যদি পঙ্গু লোকটার মুখে হাসি থাকে তাহলে আমি

কেন আনন্দিত চিত্তে থাকব না? আমার বুকের মধ্যে স্পন্দন শুরু হল।

…ভেবেছিলাম ব্যাঙ্ক থেকে একশো ডলার ধার নেব। এখন মনে হল আমি দুশো ডলার নিতে পারি। কেননা ক্যামকাস সিটিতে গেলে চাকরী আমি পাবই। আমি ধার-ত পেয়েইছিলাম এবং চাকরিও।

আজ বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামানোর সময় মনে মনে আমি গুণ গুণ করে গান গাই—

এডি রিকেনবার্ককে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। উনি হলেন তেল কোম্পানীর ডিরেকটর। কিছুদিন আগে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যে তৈলবাহী জাহাজটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এডি হলেন সেই কোম্পানীর পরিচালক।

ঐ দুর্ঘটনা আপনাকে কি শিক্ষা দিয়েছে—আমার এই প্রশ্নের জবাবে উনি বলেন, যদি তৃষ্ণা মেটাবার মত উপযুক্ত জল থাকে আর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য থাকে পর্যাপ্ত আহার তাহলে কোন কিছুর বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ করবেন না।

আজও মাঝে মাঝে এডির সংলাপ আমার কানে ভাসে।

গ্যালিভারের ভ্রমণ কথার লেখক জোনাথন সুইফটকে ইংরাজীতে অন্যতম আশাবাদী সাহিত্যিক বলা যায়। তিনি কিন্তু নিজের জীবনে এতখানি উদ্দীপ্ত ছিলেন না। নিজের জন্মদিনে তিনি পরতেন কালো পোষাক এবং সারাদিন থাকতেন উপবাসে। অথচ সাহিত্যের জগতে তিনি সুখ স্বাচ্ছন্দের সঞ্চার করে গেছেন। তার মতে পৃথিবীর তিন চিকিৎসক হল—ডাক্তার খাদ্য, ডাক্তার শান্তি এবং ডাক্তার আনন্দ।

আমাদের যা সম্পত্তি আছে সেই অতুলনীয় ঐশ্বর্যের কথা ভেবে আমরা কিন্তু প্রতিদিনই ডাক্তার আনন্দের সাহায্য পেতে পারি। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্যে। সত্যি বলতে কি, আমাদের সম্পত্তি আলিবাবার রত্ন ভাণ্ডারের চেয়েও দামী।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

যদি বলি কুড়ি লক্ষ ডলার দেব, আপনি কি আপনার চোখ দুটো বিক্রী করতে রাজী হবেন ? পা দুটোর জন্যে কত টাকা দিতে পারি ? দুটো হাত ? শ্রবণ শক্তি ? সন্তান সন্ততি ? পরিবার ?

এমনভাবে আপনার সমস্ত সম্পদকে যোগ করুন। তারপর দেখবেন রকফেলার, ফোর্ড আর মরগানরা যে সোনা সঞ্চয় করেছে তা দিয়েও আপনার সম্পত্তি কেনা যাবে না।

ওোপেন হাইমারের ভাষায়—যা আছে তা নিয়ে আমরা চিন্তা করি না, আমরা ভাবতে থাকি যা নেই তার কথা।

সত্যি এটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। যুদ্ধ, মহামারী অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানব সভ্যতার যে ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হয়েছে এই নেতিবচাক মনোবৃত্তির জন্যে।

এই হতাশাই জন পালমারকে অকাল বার্ধক্য এনে দিয়েছে। শুনুন তার করুণ গল্প।

সে থাকতো নিউ জার্সির ১৯ তম অ্যাভিনুয়েতে। কাজ করতো আর্মিতে। সেখান থেকে ফিরে এসে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করল। গোড়ারদিকে ভালই লাভ হচ্ছিল তার। তারপর দেখা দিল গণ্ডগোল। যন্ত্রপাতি মিলতো না। শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট হল। সে ভয় পেয়ে ব্যবসা দিল বন্ধ করে। রাতারাতি বার্ধক্য এসে গ্রাস করলো তাকে।

ঐ ঘটনায় সে এত বেশী ভেঙ্গে পড়ে যে তার গোটা পরিবার ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। পালমারকে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তার এক বৃদ্ধ শ্রমিক। সে বলে—জনি, নিজের আচরণের জন্যে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, তুমিই কি পৃথিবীতে একমাত্র মানুষ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ? তুমি যদি ব্যবসা বন্ধ করে দাও তাহলেও কি আর আগের দিন গুলোতে ফিরতে পারবে। তার চেয়ে তোমার উচিত সমস্যার মোকাবিলা করা। দেখবে জীবনটা এক মজার খেলা।

…আমার দিকে তাকিয়ে দেখ যুদ্ধে আমার একটি হাত চিরদিনের মত অকেজো হয়ে গেছে। মুখের অর্ধেকটা বীভৎস ভাবে পুড়ে গেছে।

তবুও আমি জীবনের লড়াইতে পরাজয় স্বীকার করিনি। তুমি যদি ভেঙে পড় তাহলে সর্বস্ব হারাবে। তোমার ব্যবসা বন্ধ হবে, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে, বাড়ী হারাবে, বন্ধু হারাবে।

ঐ উক্তি তাকে একেবারে বদলে দিল। সে নতুন করে ব্যবসা করতে শুরু করলো। আজ জন পালমার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার।

আমার এক বান্ধবীর গল্প বলি। তার নাম হল জোহানা। আমি যখন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অফ জার্নালিজ'মে ছোট গল্প লেখার ক্লাস করতাম তখন সে ছিল আমার সহপাঠিনী, নবছর আগে তার জীবনে একটা বিপর্যয় ঘটে যায়। সে থাকতো এরাজোনার টুসকান শহরে। তার গল্প তার মুখ থেকেই শুনুন।

...আমি অ্যারি জোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছি। শহরে স্কুল খুলেছি, ডেজারটগু রেঞ্চে গানের স্কুল চালাই। এমন ভাবে কেটে যায় আমার কর্ম ব্যস্ত জীবন। ঘোড়ায় চড়ে বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়াই। পার্টিতে যাই, নাচের আসরে যোগ দিই। দিনগুলো প্রজাপতির পাখায় ভর দিয়ে তির তির করে উড়ে চলে।

কিন্তু এত সুখ যেন আমার কপালে সইলো না। সেই দিনটা মনে পড়ে। সকালবেলা হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন —এক বছর বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ডাক্তারের কথাটা শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমি কি করে সারাটি বছর শুয়ে শুয়ে কাটাবো?

কি করে পঙ্গুর মত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাব? আতঙ্ক এসে গ্রাস করলো আমায়। আমি শিশুর মত কাঁদতে শুরু করলাম। ডাক্তার আমাকে কোনরকম উৎসাহ দিলেন না। কিন্তু এগিয়ে এলেন আমার এক প্রতিবেশী। তিনি হলেন এক শিল্পী। তার নাম রিচার্ড। তিনি বললেন—এই এক বছরের মধ্যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার কর। দেখবে নিঃসঙ্গতার বেদনা থেকে তোমার আত্মা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। মনে হবে ঐ যেন তোমার এক নবজন্ম।

শিল্পী বন্ধুর কথায় নির্বাসনের দিনগুলো নতুনভাবে কাটিয়ে দিলাম। সত্যি বলতে কি, ধীরে ধীরে আমার মধ্যে যে দার্শনিক মনোভাবের বিস্তাশ হল তার স্বাদ আমি কখনও পাইনি। মনে হল যেন নতুন এক জগতের দ্বার খুলে গেছে। সেখানে শুধু আলো আর আলো আনন্দ হাসি আর গান।

সত্যিই তো জীবনে গর্ব করার মত অনেক কিছুই আমার আছে। সৌন্দর্য, যৌবন, আছে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি। রেডিওতে কান রাখলে শুনতে পাই সুমধুর সঙ্গীত। পড়ার জন্য আছে অসংখ্য বই। আছে উত্তম আহার, সৎবন্ধু। আমি এত হাসিখুশী হয়ে গেলাম এবং এত বেশী লোক আমাকে দেখবার জন্য ভিড় জমাতে শুরু করলো যে বাধ্য হয়ে ডাক্তার এক নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, এক ঘণ্টায় মাত্র একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে।

সেই থেকে নটি বছর কেটে গেছে। আমি এখন পরিপূর্ণ জীবন লাভ করেছি। কিন্তু বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া ঐ বছরটির কথা কোনদিন ভুলতে পারবো না। মনে হয় জীবনে অমন সুখ সমৃদ্ধ মূল্যবান সময় আর কখনোও আসেনি।

জোহানার উক্তি শুনে মনে পড়ে যায় দুশো বছর আগে ডাক্তার স্যামুয়েল জনসনের কথা—নিঃসঙ্গতা মানুষকে অনন্ত শান্তির সন্ধান দেয়।

মনে রাখবেন যে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন এমন একজন মানুষ যিনি কুড়ি বছর ধরে বিপদ হতাশা আর উত্তেজনার কথা জেনেছেন। এবং অবশেষে পরিণত হয়েছেন তাঁর সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকে।

লোগাম স্মিথ তাঁর সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করেছেন ছোট কথায়। তিনি বলেছেন—আমাদের জীবনে দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথমতঃ কি আমাদের চাহিদা সে সম্পর্কে সজাগ হওয়া। দ্বিতীয়ত সেই চাহিদাকে পুরণ করার পর তাকে ভোগ করা। সমস্ত মানুষ জাতির মধ্যে মাত্র কয়েক জনই দ্বিতীয় গুণটি অর্জন করতে পারে।

আপনি যদি বোরগিড ডালের বই পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে কিভাবে রান্নাঘরে ডিশ ধোরার মত সাধারণ কাজকেও উত্তেজনায় ভরপুর করা যায়। এই বইটি লিখেছেন এমন এক লেখিকা যিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অন্ধত্বের অভিশাপ বহন করেছেন।

তাঁর ভাষাতে বলি—ছিল আমার একটি মাত্র চোখ। কিন্তু সেই চোখের ওপর ঢাকা ছিল কালো পর্দা। তাই আমাকে হাতড়ে হাতড়ে সবকাজ করতে হত।

কিন্তু ঐ অন্ধ মহিলা কারোব কাছে দয়া ভিক্ষা করেন নি। শিশুকাল থেকে সে অন্যদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে চেয়েছে। সে তো চোখে দেখতে পেত না। কিন্তু মাঠের ওপর হাত রেখে রেখে প্রত্যেকটা জায়গা এমনভাবে চিনে নেয় যে দৌড়ের খেলায় তাকে কেউ হারাতে পারতো না।

পড়াশুনার জন্য উনি নিজস্ব এক পন্থা আবিষ্কার করেন। বইটাকে চোখের সামনে নিয়ে এসে অক্ষরের উপর চোখের পাতা বোলাতেন। এমনভাবে উনি দুটি কলেজ ডিগ্রী লাভ করেন।

মিনোসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ডিগ্রী আর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী।

তারপর শুরু হল তাঁর জীবিকার সন্ধান। টুইন ভ্যালির ছোট গ্রামে তিনি পড়াতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে দক্ষিণ ডাকোটার অগষ্টানা কলেজে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা হলেন। তের বছর ধরে উনি মেয়েদের পড়িয়ে গেছেন আর ওই পড়া সম্পর্কে রেডিওতে ভাষণ দিয়েছেন।

ছাত্রীদের মুখ থেকে জানা গেছে যে তাদের এই অধ্যপিকাকে কেউ কোনদিন অখুশী দেখেনি।

তারপর এলো ১৯৪৩ সাল। বোরজিভ তখন ৫২ বছরের প্রৌঢ়া। বিখ্যাত মেয়ে ক্লিনিকে হলো এক অপারেশন, যার মাধ্যমে উনি আবার তাঁর হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

বুঝি নতুন এক জগতের দুয়ার গেল খুলে। এই পৃথিবীর চারিদিকে যত আনন্দ আছে, আছে যত হাসি আর গান, তার সম্পর্কে লোভীর মত একই ভোগ করতে চাইলেন তিনি। যেমন আনন্দের মুক্ত মালায় রচনা করবেন রুমনার।

আজ তাই এই পৃথিবী তাঁর কাছে এক মধুর পান্থ নিবাস। রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকার মধ্যেও তিনি অসীম আনন্দের সঙ্কেত শুনতে পান। ডিশ ধোয়ার সময়ে সাবানের বুদবুদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান ছোট্ট রামধনুর সাতরঙের অপূর্ব বাহার।

কাজ করতে করতে হঠাৎ চোখ পড়ে জানলায়। পুরু পুরু তুষারের মধ্যে উড়তে থাকা পাখীদের ধুন কালো ছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় ওরা যেন স্বর্গের দূত।

উনি মনে মনে বলেন—হে ঈশ্বর, হে স্বর্গ নিবাসী মহাপ্রভু, তুমি এই অনন্ত ঐশ্বর্যের স্রষ্টা। তোমাকে স্মরণ করি।

কল্পনা করুন, সাবানের বুদবুদের মধ্যে রামধনুব খেলা দেখে আর উড়ন্ত পাখীর দিকে চোখ রেখে উনি ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন।

মনে হয় এই অসামান্য জীবন কাহিনী শুনে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, কেননা আমরা আমাদের হাসিতে ভরা মুহূর্তগুলোকে হেলায় হারাচ্ছি। চোখ থাকতেও আমরা অন্ধ। তাই বিচিত্র সুন্দর এই পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র্য আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না।

যদি ভালভাবে বাঁচতে চান তাহলে মনে রাখবেন—সমস্যাকে তুচ্ছ করতে হবে, আশীর্বাদকে গণ্য করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অকারণ সমালোচনা ক্ষতি ডেকে আনে

১৯২৯ সালে আমেরিকার শিক্ষা জগতে একটা তীব্র আলোড়ন উঠেছিল। নানান রাজ্য থেকে শিক্ষিত লোকেরা ছুটে গিয়েছিলেন শিকাগো শহরে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল রবার্ট হাচিন নামে এক মানুষের অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করা। তিনি জীবন শুরু করেছেন এক সাধারণ কর্মচারী হিসেবে। তারপর অসামান্য মেধা আর অধ্যাবসায়কে পাথেয় করে ধীরে ধীরে উন্নতির ধাপে ধাপে উঠতে থাকেন।

মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

তাঁর বৈচিত্রময় কর্মজীবনে তিনি করেননি এমন কাজ নেই। কখনোও হয়েছেন কাগজের হকার, কখনো কাজ করেছেন হোটেলে বয় হিসেবে।

রাবার্ট হাচিনের এই অবিশ্বাস্য কৃতিত্বে প্রবীন শিক্ষাবিদেরা অবাক হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই তরুণ রবার্টকে স্বীকার করতে চাইছিলেন না। এমন কি খবরের কাগজের সম্পাদকেরা তাঁর বিরুদ্ধে শানিত আক্রমণ করে বসে।

অবশ্য এমন ঘটনা আরও ঘটেছে। যেমন ধরুন ওয়েলসের রাজকুমারের কথা। পরবর্তী কালে ইনি অষ্টম এডওয়াড নামে পরিচিত হন। তারপর হয়েছিলেন উইণ্ডসরের ডিউক। কিশোরকালে ইনি ডেভনসায়ারের ভারতমথ কলেজে পড়তেন। এখন তাঁর বয়েস ছিল মাত্র চৌদ্দ। সেই বয়েস থেকে তিনি যুদ্ধ পরিচালনার কাজে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন।

তবে জীবনে বড় হতে গেলে একটা কথা মনে রাখবেন—সমালোচনাকে কোন দিন গুরুত্ব দেবেন না। কেননা তাহলে সমালোচকরা

পেয়ে বসবে আর এটা তো সত্যি যে, যারা জীবনে কিছু করতে পা‌ে নি তারাই সমালোচক সেজে বসে।

যখন আমি এই অধ্যায়টি লিখছিলাম তখন এক ভদ্র-মহিলা‌ কাছ থেকে একটি চিঠি পাই, কদিন আগে আমি স্যালভেসান আর্কি‌ প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল উইলিয়াম বুথ সম্পর্কে একটি বেতার ভাষণ দিয়ে ছিলাম। এই মহিলা হয়তো জেনারেল বুথকে সহ্য করতে পারতে‌ না।

ওনার চিঠি পড়ে জানা গেল জেনারেল বুথ নাকি জনগণের তহবিল থেকে আশি লক্ষ ডলার চুরি করেছেন। এই টাকাটা গরীব লোকে‌ জন্যে তোলা হয়েছিল।

এ ধরনের হীন মানসিকতা আর কিছুই নয়, এ হল অপরে‌ উন্নতিতে নিজের অক্ষমতার প্রকাশ। ভাগ্য ভালো আমি ঐ মহিলা‌ কথাতে কোন গুরুত্ব দিলাম না এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম যে ঐ রমণীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

অনেকদিন আগে সোপেনহাইমার বলে গেছেন মনীষীদের ত্রুটি বিচ্যুতি অন্বেষণে সাধারাণ লোকেরা বিকৃত আনন্দ পেয়ে থাকে।

এবার শুনুন আর এক বিশিষ্ট লোকের কথা। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী এক ভদ্রলোক সম্পর্কে তিনি যে কুৎসিত মন্তব্য করেন তা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। তিনি বলেছিলেন—যদি এই লোকটি আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয় তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের মা বোনেরা আইন সম্মত গণিকা বৃত্তির জালে জড়িয়ে পড়বে। তাদের চরিত্রকে অপমানিত করা হবে, পরিবেশ হবে দূষিত, পাপের প্লাবনে দেশ ভেসে যাবে। ঈশ্বর আর মানুষের কোন স্থান থাকবে না।

কথাগুলি শুনলে মনে হবে এগুলি প্রস্তুত হয়েছে হিটলার সম্পর্কে। কিন্তু শুনলে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে টমাস জেকারসনের মত এক

অমর মানুষ সম্পর্কে এই কুৎসিত ইঙ্গিত করা হয়েছিল। যেফেভারসন স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের রচয়িতা, তিনি গণতন্ত্রের শ্রদ্ধেয় ধাবক ও বাহক, তার সম্পর্কে এই নিলর্জ্জ উক্তি আমাদের বিস্মিত করে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি যে ছলনা মানুষকে হত্যাকারীতে পরিণত করে। আমেরিকার এক সংবাদপত্রে একটি কার্টন প্রকাশিত হয়। তাতে দেখানো হয়েছে এক গিলোটিনের ছবি। একজন মানুষ বিশাল ছুরির নীচে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। জনগণ এই দৃশ্য দেখবার জন্যে উল্লাস করছে।

এখন বলুন তো ঐ মানুষটি কে হতে পারেন ?

উত্তর শুনে যেন চমকে যাবেন না।

উনি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

অবশ্য এই ঘটনা ঘটবার পর অনেকগুলি বসন্ত এসে বিদায় নিয়েছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে।

মানুষ হয়তো আগের চেয়ে আরও বেশী উন্নত ও সভ্য হয়েছে।

আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক।

১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল অ্যাডমিরাল পিয়ারী শ্লেজ গাড়ীতে চড়ে উত্তর মেরুর বকে পা রাখলেন। যে লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ চেষ্টা করেছে, যে মেরু মরীচিকার মত হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। অবশেষে সে হল পরাস্ত। পিয়ারীও মৃত্যুর মুখ থেকে কোন রকমে ফিরে এসেছেন। পায়ের আটটি আঙুল বরফে জমে পচে গেছে। এই জয়ে তিনি এত উত্তেজিত যেন উন্মাদ হয়ে যাবেন।

ওয়াশিংটনের অফিসাররা কিন্তু নিচু তলার কর্মচারী পিয়ারীর এই সফলতাকে স্বাগত জানাতে পারলেন না। উত্তর মহাসাগরে অভিযান চালিয়ে সরকারী অর্থ নষ্ট করাকে নিন্দে করলো তাঁরা। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আদেশ এলো যে পিয়ারীকে অভিযান বন্ধ করতে হবে।

এই হল আমাদের জীবন ব্যাপিপরিশ্রমের পুরস্কার !

জেনারেল গ্যারাণ্টের অভিজ্ঞতা আরও নির্মম। ১৯৬২ সালে তিনি যে জয়লাভ করেন তাতে আমেরিকার ইতিহাসে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। এই জয়ের ফলে উত্তরবাসীরা সুবিধাজনক অবস্থায় পৌছে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল এই যে গ্রাণ্ট মাত্র একদিনের মধ্যে ঐ অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন।

এই বিষয় তাঁকে রাতারাতি বসিয়ে দিল বীরের আসনে। মাইন থেকে নির্জিস সিপের তীরে বেজে উঠলো ঘণ্টাধ্বনি, জ্বলে উঠলো আগুন। এমন কি সুদুর ইউরোপের বুকে আছড়ে পড়লো জেনারেল গ্রাণ্টের সাফল্য বার্তা।

এই বিরাট বিজয়ের ছ'সপ্তাহের মধ্যে গ্র্যাণ্টকে কারারুদ্ধ করা হল। তাঁর সৈন্য বাহিনীকে কেড়ে নেওয়া হল। তিনি হতাশা ও অপমানের মধ্যে মুখ লুকালেন।

প্রশ্ন করতে পারেন, সাফল্যের চূড়ায় ওঠবার পর জেনারেল গ্র্যাণ্টকে কেন কারারুদ্ধ করা হল ? এর একটাই উত্তর আছে, গ্র্যাণ্টের অবিশ্বাস্য বিজয় তাঁর অফিসারদের মনে হিংসা জাগিয়া তোলে।

তাই মনে হয় সমালোচনার প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন যে অকারণ সমালোচনা হল ছদ্মবেশী প্রশংসা কেননা মৃত কুকুরকে কেউ লাথি মারে না।

সপ্তম অধ্যায়

সমালোচনা প্রতিরোধের উপায়

আমি একবার মেজর জেনারেল বার্টলারের সাক্ষাত নিই। ইনি হলেন মার্কিন নৌবাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেনারেল।

ছোট বেলা থেকে ইনি জনপ্রিয় হবার জন্য মেতে ওঠেন। উনি চাইতেন সকলের সুনজরে থাকতে। তখন সামান্য সমালোচনাতে ওনার চোখে জল এসে যেত। কিন্তু ত্রিশ বছর ধরে নৌবাহিনীতে কাজ করার পর আজ উনি পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছেন।

মনে পড়ে এক হারানো স্মৃতি। কয়েক বছর আগে নিউইয়র্কের "সান" পত্রিকার এক রিপোর্টার এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন আমি বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। কয়েকদিন পরে দেখি উনি আমার কাজের বিদ্রূপ সমালোচনা করেছেন।

সেই রিপোর্ট পড়ে আমি যেন ক্ষেপে গেলাম। মনে হল আমাকে উনি ব্যক্তিগত ভাবে অপমান করেছেন। আমি সান পত্রিকার চেয়ার ম্যানকে ডেকে জোর শাসানি দিলাম। আজ এই ঘটনার কথা ভাবলে মনে মনে লজ্জিত হই।

কেননা কাগজটি যারা কিনেছিল তাদের অর্ধেকের চোখে লেখাটি পড়ে নি। যারা পড়েছিল তাদের অর্ধেক সেটির মানে উদ্ধার করতে পারে নি। যারা মানে উদ্ধার করেছিল তাদের অর্ধেক দুএক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু ভুলে যায়।

এখন আমি বুঝতে শিখেছি যে কেউ আর কারোর কথা ভাবে না। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। প্রাতঃরাশের আগে, প্রাতঃরাশের পরে, এমন কি মাঝরাতেও তারা নিজেদের কথাই ভাবে। নিজেদের মাথায় যন্ত্রণা হলে তারা যতখানি ব্যস্ত হয় আপনার আমার মৃত্যু সংবাদ তাদের অতটা বিচলিত করতে পারে না।

তাই মনে হয় কে কি বলছে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য আমি সমালোচনা কে অগ্রাহ্য করতে বলছি না। আমি বলছি সেই সমস্ত সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে যাদের কোন ভিত্তি নেই।

একবার আমি প্রেসিডেন্টের পত্নীকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করি। তাঁর যতবেশী ছদ্মবেশি বন্ধু আর ভয়ঙ্কর শত্রু ছিল, তেমনটি আর কোন হোয়াইট হাউস বাসিনীর ছিল বলে মনে হয় না।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে কিশোর বেলায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। তিনি কারোর সমালোচনাকে ভীষণ ভয় পেতেন। একবার তিনি তাঁর কাকীমাকে প্রশ্ন করেন—অ্যান্টি, আমি এই কাজটা করতে চাই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে হয়তো লোকে আমার সমালোচনা করবে।

আজ তিনি চোখ বন্ধ করে বলতে পারেন মনে মনে সেটাকে সঠিক বলে ভাববো তাই করবো। কারোর সমালোচনার জন্যে মোটেই বসে থাকবো না।

আমেরিকাতে একটি সংস্থা আছে, তার নাম আমেরিকান ইনটার ন্যাশানাল করপোরেশন। আমি একবার এই সংস্থার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, হাসি খুশী চেহারার ঐ ভদ্রলোক আমার কাছে খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করলেন যে জীবনের প্রথম অর্ধ তিনি ছিলেন যথেষ্ট মুখচোরা। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই মনোভাব অনেকটা কেটে যায়। আজ তিনি অতবড় একটা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হয়ে হাজার রকম সমস্যার সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে দিয়েছেন।

ডিমস টেলার আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি নিউইয়র্ক ফিল হারমোনিক সিমফনি অরকেস্ট্রার রবিবারের সান্ধ্যকালীন বেতার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমালোচনা করে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন। এক মহিলা শ্রোতা সরাসরি তাকে চিঠি লেখেন এবং মিথ্যুক, বিশ্বাস ঘাতক, শয়তান প্রভৃতি বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করেন।

তিনি তাঁর "মেন অ্যাণ্ড মিউজিক" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—ঐ

মহিলা শ্রোতাটি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে আমার সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসতে চাননি। হয়তো গঠনমূলক সমালোচনা করার মত কিছুই ছিল না ওনার।

এই উক্তিটা আমাদেব মনে রাখতে হবে। যখন কেউ সত্যিকারের সমালোচনা করতে ভয় পায় তখনই সে আজে বাজে বিশেষণ প্রয়োগ অবদমিত মনের ভাব প্রকাশ করে। এমনটি অতীতে বার বার ঘটতে দেখা গেছে। আর ভবিষ্যতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।

গৃহযুদ্ধের চাপে লিঙ্কন হয়তো ভেঙে পড়তেন। কিন্তু সমালোচকের মোকাবিলা করা এক বিরলতম ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি যে ভাবে শত্রুপক্ষের প্রতিটি প্রশ্নেব উত্তর দিয়ে গেছেন তা আমাদের অবাক করে। শুধু তাই নয় নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে লিঙ্কন একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যাকে সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারে একটি সুতো রূপে বিবেচনা করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে মানুষ হিসেবে লিঙ্কন কত বেশী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন।

যখনই কেউ অকারণে আপনাকে দোষারোপ করবে তখন ওই শব্দ কটি মনে রাখবেন--কাজের মধ্যে ফাঁকি দেবেন না। তারপর আত্মরক্ষার ছাতাটি খোলা রাখুন, যাতে সমালোচনার বৃষ্টিধারা আপনাকে ভিজিয়ে না দেয়।

অষ্টম অধ্যায়

মধু আহরণে ব্যর্থ হলে মৌচাকের দোষ কি ?

১৯৩১ সালের ৭ই মে।

নিউইয়র্ক বাসীরা এই দিনটি সহজে ভুলে যেতে পারবে না।

তার কারণ কি ?

অনেকদিনের অনুসন্ধানের শেষে এক কুখ্যাত ডাকাত ক্রাউলে ধরা পড়েছে। যে বন্দুকবাজ লোকটি ধূমপান করতো না বা মদ পান করতো না তাকে ওয়েস্ট এণ্ড অ্যাভিনিউর একটি ফ্ল্যাট থেকে অতর্কিতে ধরা হয়। তখন সে তার বিনোদিনীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিল।

একশো পঞ্চাশ জন পুলিশ আর গোয়েন্দা তাকে ধরবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তারা ঐ মারাত্মক হত্যাকারীর ঘরে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছিল। আবার আশেপাশের বাড়ীতে মেশিনগান বসায়। নিউইয়র্কের অভিজাত গৃহস্থ পরিবেশটি বুলেটের স্পন্দনে কেঁপে কেঁপে ওঠে। আমার দেশের উৎকণ্ঠিত মানুষ দুরু দুরু বুকে ঐ অবিশ্বাস্য লড়াইকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে।

ক্রাউলে নামের সেই বীভৎস বন্দুকবাজ একটা চেয়ারের আড়ালে বসে থেকে পুলিশের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যায়। অবশেষে তাকে ধরা দিতে হয়। পুলিশ কমিশনার ঘোষণা করেন যে নিউইয়র্কের ইতিহাসে কুখ্যাততম ডাকাত ধরা পড়েছে। তাকে এক মুহূর্ত বাঁচিয়ে রাখা হবে না।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত উত্তেজনা সেই ক্রাউলে নিজের সম্পর্কে কি চিন্তা করেছে ?

যখন পুলিশ তার ফ্ল্যাটে অবিরাম আক্রমণ করছিল, তখন সে একটা চিঠি লেখে। সম্ভাষণের জায়গায় লেখা ছিল—পৃথিবীর যে কোন

মানুষকে। * যখন সে লিখছিল তখন তার টাটকা ক্ষত থেকে ছুটে আসা রুধিত শ্বেত শুভ্র কাগজকে টকটকে লাল করে দেয়।

ঐ চিঠিতে ক্রাউলে বলেছে—আমার এই বীভৎস পোষাকের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক উদ্বীগ্ন হৃদয়। যে হৃদয় কোন দিন কোন পাপ করতে পারে না।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে ক্রাউলে পথ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে আসছিল। জনৈক পুলিশ তার কাছে এসে বলে—আপনার লাইসেন্সটা একবার দেখাবেন কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে একটি কথা না বলে ক্রাউলে তার পিস্তল বের করে এক ঝাঁক তপ্ত সীসা উপহার দেয়। মৃত প্রায় পুলিশ অফিসারটির রক্তাক্ত দেহ যখন বসুমাতার বুকে আশ্রয় নিতে উদ্যত তখন সে তার রিভলবার কেড়ে নিয়ে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে।

কি আশ্চর্য! এই লোকটি লিখছে—আমার হৃদয় কখনো কোন পাপ করতে পারে না।

ক্রাউলেকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসানো হয়েছিল। যখন তাকে পটভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে কি বলেছিল—মানুষকে হত্যা করে এই আমার উপহার ?

না, দৃপ্ত কণ্ঠে সে বলে—নিজেকে বাঁচতে গিয়ে এই শাস্তি পেলাম।

আমার এই গল্প বলার অন্তরালে একটা ছোট্ট উদ্দেশ্য আছে। তাহলো এই যে—ক্রাউলে কখনো কোন কাজের জন্যে নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করে নি।

এটা কি শুধু আসামীদের মধ্যে দেখা যায় ? নাকি পৃথিবীর মানুষ নিজেদের কাজ সম্পর্কে এই মনোভাব পোষণ করে।

তাহলে আর একটা গল্প শোনা যাক।

"আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় কাটিয়েছি মানুষকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে। আমি যা করছি তাকে অন্যায় বলতে পারি না। কেননা আমার প্রতিটি কাজের অন্তরালে ছিল মনের সমর্থন।

এই উক্তিটি হল অ্যাল ক্যালোনের। একদা যে ছিল আমেরিকার একনম্বর কঙ্কে। গোটা শিকাগো শহরের বুকে যে জ্বালিয়ে ছিল অরাজকতার আগুন। নিজেকে সে ভাবলো জনগণের সেবক। কি বিচিত্র তার মনের ভাবনা।

ডালে স্মুলজ নামে আর এক সাংঘাতিক হত্যাকারীও নিজের সম্পর্কে এই উক্তি করে গেছে। খবরের কাগজের সাংবাদিকদের সঙ্গে এক স্বাক্ষাতকারে সে খোলাখুলি বলেছে—জনগণের সেবা করার জন্যে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি এবং সারা জীবন দিয়ে আমি তা করে যাব।

এক জেলখানার কারা রক্ষীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা করেছিলাম। তিনি আমায় যে কথা বলেন তা বড়ই বিস্ময়কর। আসামীদের মধ্যে—প্রায়ই সকলেই মনে করে যে তারা কোন দোষ করেনি। আসলে আপনার আমার মত তারাও তো মানুষ। তাই তারা যুক্তি দিয়ে নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। হয়তো সেই যুক্তির মধ্যে তর্ক নেই, হয়তো তা একেবারে নিছক অহনিজ বোধের নির্লজ্জ বহিঃ প্রকাশ। তবু স্বীকার করতে হবে যে তারা তাদের অসামাজিক কাজকর্মের স্বপক্ষে যে কথা বলেছে তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সমালোচনা ব্যাপারটা ভাল। কেননা ওর ফলে মানুষ আত্মরক্ষায় তৎপর হয়। আবার নিজের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে।

সমালোচনা মারাত্মক। কেননা এ মানুষের অমূল্য গৌরবকে আঘাত করে, তার আত্ম গরিমাকে আঘাত করে এবং তার মনে বিদ্রোহের গোপন বীজ বপন করে।

জার্মান আরমিতে একটি প্রথা ছিল যে সৈন্যেরা কোন অভিযোগ দাখিল করতে পারবে না। কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তাকে ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভাবতে হবে। তাতেই সে অভিযোগ করতে পারবে। কেউ যদি সঙ্গে সঙ্গে তা করতো তবে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা সমালোচনা হতে উদ্ভুত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পেতে পারি। যেমন ধরুন, প্রেসিডেন্ট কি সিওডোর রূজভেলট আর প্রেসিডেন্ট থাপট এর মধ্যে মনোমালিন্য। এর ফলেই রিপাবলিশনে পার্টিতে ভাঙন ধরে এবং উডরো হিলসন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেন। শুধু তাই নয়, এই খটনাই বিশ্বযুদ্ধতে ত্বরান্বিত করে পৃথিবীর ইতিহাসটা একে বারে বদলে দেয়।

আসুন, চটপট একবার ঐ ভুলে যাওয়া ঘটনাটা স্মরণ করা যাক।

১৯০৮ সালে থিওডোর রুজভেলট হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং থাফটকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করে সিংহ শিকার করতে আফ্রিকার জঙ্গলে চলে যান। ফিরে এসে তিনি প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হন। কেননা তাঁর মতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাফটের কাজকর্ম নাকি সঠিক হয় নি। তিনি তৃতীয় বারের জন্য পদপ্রার্থী জন এবং বুলমুজ পার্টি গঠন করেন।

নির্বাচনে দেখা যায় উইলিয়াম হাওয়ায় থাফট ও রিপাবলিকান পার্টি মাত্র দুটি রাজ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যত্র ঘটেছে অভাবিত পরাজয়।

থিওডোর রুজভেলট থাফটের বিরুদ্ধে দোষারোপ করলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট থাফট কি নিজের কাজের জন্যে অনুতপ্ত ছিলেন ?

কখনই নয়। অশ্রুভরা তিনি বলেন—আমার কাজের মধ্যে কি গলদ রয়েছে—তা আমি বুঝতে পারছি না।

কে দায়ী ? রুজভেলট না থাফট !

সত্যি কথা বলতে কি এর উত্তর আমার জানা নেই। যে কথাটা আমি বলতে চাই তাহলে। এই যে রুজভেলটের সমালোচনার মুখে থাফট কিন্তু তাঁর স্বীকার করেন নি। এর ফলে থাফট আত্মরক্ষার পাল্লা ভারী করেন এবং অশ্রু ভরা চোখে বলেন—আমার কাজে কি গলদ হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি না।

অথবা যদি আমরা টি-পট ডোমের কথা ধরি, সেই ঘটনাকি আপনাদের মনে পড়ছে ?

যে কলঙ্ক অনেক বছর ধরে খবরের কাগজের সাংবাদিকদের মনে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন।

বলা যেতে পারে ঐ ঘটনা সারা দেশকে নাড়া দিয়েছিল। আমেরিকার জীবনে এ জাতীয় ঘটনা আগে ঘটেছিল বলে মনে হয় না। আমি সংক্ষেপে সেটা বর্ণনা করছি। অ্যালবর্ট ফল নামে এক ভদ্রলোক জারভিং ক্যাবিনেটে সেক্রেটারীর কাজ করতেন। উনি এলক হিল আর টিপোট ডোমে তেল সরবরাহ করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি সেই আকর্ষনীয় দায়িত্ব তুলে দিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু এডওয়ার্ড এল-ডোহনিকে।

ডোহণি এখন কি করলেন।

তিনি কয়েক লক্ষ ডলার ধরে চেয়ে বসলেন। অর্থাৎ অত্যন্ত সন্তর্পণে সেক্রেটারী ফল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈল ব্যবসাকে বিপদের মুখোমুখী ঠেলে দিলেন। অন্য প্রতিযোগীদের বিতাড়িত করতে যেন ব্যাবহৃত হল বন্দুকের নল। অবশেষে এই ঘটনা আদালতের প্রাঙ্গনে এসে পড়ে এবং হারডিং প্রসাশনের ভিত্ কাঁপিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় সমস্ত রিপাবলিকান পার্টিকে বিচ্ছেদের মুখোমুখি ঠেলে দেয়।

এর ফলে অ্যালবট ফলবে বহুবছর কাটাতে হয় রূদ্ধ কা অন্তরালে।

ফলকে প্রচণ্ড ভাবে অভিযুক্ত করা হল। কে অভিযোগ সাধার আমরা দেখতে পাইনা। কিন্তু তিনি কি তাঁর কাজের জন্য অনুতপ্ত বোধ করেছেন? না। কয়েক বছর বাদে আরবাট জুভার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে প্রেসিডেণ্ট হারভিংয়ের মৃত্যু ঘটেছে মানসিক উত্তেজনার জন্য। কেননা বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছ থেকে ঐ আঘাত পাবার পর তিনি মনের ভার-সাম্য হারিয়ে ফেলেন। শ্রীমতী ফল এই কথা শুনে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন এবং ভাগ্যের প্রতি মুষ্টাঘাত করে কান্না ভেজা গলায় চীৎকার করেন—কি বলছেন! হারভিডংকে ফল প্রতারিত করেছেন? না? আমার স্বামী কখনো কারোকে প্রতারিত করতে পারেন না। এমন কি

চোখের সামনে রাশি রাশি রাশি সোনা থাকলেও উনি ভুল কাজে প্রলুব্ধ হবেন না। বরং বলা যেতে পারে আমার স্বামীকেই প্রতারিত করা হয়েছে এবং তিনি যীশুর মত ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছেন।

এই হল আমাদের স্বভাব। যে মানুষ অন্যায় করে সে নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে দোষারোপ করে থাকে। এ হল আমাদের বিচিত্র মানসিকতা। যদি আমরা আজ অথবা আগামীকাল অন্য কারোকে সমালোচনা করতে যাই তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যাকস্থাপনো, ক্রাউলো এবং অ্যালবার্ট ফলকে।

বলা যেতে পারে সমালোচনা হল ঘরবন্দী পায়রার ঝাঁক। যারা নীল আকাশে ডানা ঝাপটিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আবার ফিরে আসে তাদের অতি পরিচিত গৃহাঙ্গনে।

১৮৬৫ সালের ১৫ই এপ্রিল।

শনিবার, সকালবেলা।

যখন আব্রাহাম লিঙ্কনের রক্তে রঞ্জিত দেহটি শোয়ানো ছিল সস্তা দামের সরাইখানার বিছানাতে। একটু আগে তাকে তুলে আনা হয়েছে ফোরথ থিয়েটারের করিডর থেকে, যেখানে বুথ তাকে গুলিবিদ্ধ করে। লিঙ্কনের দীর্ঘ দেহ কোনাকুনিভাবে শোয়ানো রয়েছে। কেননা খাটটি তাঁর দৈর্ঘ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এমন একটি ছবি আমরা দেখতে পাই রোসা বেনহুয়ের "দি হর্স-ফেয়ার"। সেটি টাঙানো ছিল দেয়ালে এবং যার ওপর একগুচ্ছ হলুদ আলো এসে পড়েছিল!

মৃত লিঙ্কনকে দেখে এক সেক্রেটারী মন্তব্য করেন—ওখানে শায়িত আছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে জনসংযোগ সম্পর্কে লিঙ্কনের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ কি!

আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে তাঁর জীবন নিয়ে গভীর অধ্যায়নরত এবং অনেক দিনের পরিশ্রমে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি যার নাম

হল— লিঙ্কন দি আননোন। আমি বিশ্বাস করি যে লিঙ্কনের পারিবারিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এত বেশী অন্বেষণ আর কেউ করেন নি। আমার গ্রন্থের মধ্যে আমি লিঙ্কন চরিত্রের যে দিকটি সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করেছি, সেটি হল তাঁর জনসংযোগের ক্ষমতা।

তিনি কি সমালোচনাকে ভয় করতেন? অথবা নিজেই অন্যের সমালোচনা করতেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ। লিঙ্কন যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদটি অলংকৃত করেন নি, ছিলেন তিনি ইনিডিয়ানার পিজিয়ান ক্রিক ভ্যালির সাধারন মানুষ। তখন তিনি নানা বিখ্যাত লোককে হেনস্তা করে খোলা চিঠি আর কবিতা লিখে ছড়িয়ে রাখতেন গ্রাম্য পথে। যাতে পথচলিত মানুষের নজরে পড়ে।

এমন কি লিঙ্কন যখন ইলিনসের স্প্রিং ফিল শহরে তরুণ আইনজীবি হিসেবে কাজ করছেন তখনও তিনি বিরুদ্ধ ব্যবহারজীবীদের সম্পর্কে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় লিখতেন খোলা চিঠি।

১৮৪২ সালের শরৎকালে তিনি জেমস শীল্ড নামে এক আইরিশ রাজনৈতিক নেতাকে আক্রমণ করে স্প্রিং ফিল জার্মান কাগজে বেনামী চিঠি ছাড়েন। এই ঘটনায় সমস্ত শহরে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়। এবং অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ও গর্বিত শীল্ডের মনে নিদারুন আঘাত দেয়।

শীল্ড এত বেশী ক্রুদ্ধ হন যে খুঁজে পেতে পত্রপ্রেরকের পরিচয় বের করে তাঁকে সম্মুখ সমরে আমন্ত্রণ করেন।

লিঙ্কন ডুয়েল লড়তে চাননি। কিন্তু শীল্ডের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন না। অবশেষে তাঁকে নিজের পছন্দ মত অস্ত্র নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হল। আজানু লম্বিত বাহু থাকায় তিনি চওড়া তরবারি-টাই বেছে নিলেন। এমন কি এক বিখ্যাত তরোয়াল বিদের কাছ থেকে তরোয়াল খেলার প্রশিক্ষণ লাভ করলেন। অবশেষে নির্দিষ্ট

দিনে তিনি এবং শীল্ড হাজির হলেন মিসিসিপি নদীর তীরে, বিস্তৃত বালুকাভূমিতে। সেদিন যে কোন একজনের জীবন দীপ নির্বাপিত হত, যদি না একেবারে শেষ মুহূর্তে তাদের লড়াই বন্ধ করে দেওয়া হতো।

এই ঘটনাটিকে লিঙ্কনের জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এই ঘটনা তার ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট ছাপ ফেলে ছিল এর পরে তিনি আর কখনোও কারোকে অপমান করে চিঠি লেখেন নি, কোন মানুষের দুর্বলতা নিয়ে প্রকাশ্যে উপহাস করেন নি। তারপর থেকে লিঙ্কনকেও প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি।

গৃহযুদ্ধের সময় লিঙ্কন একে একে অনেক জেনারেলকেই ফটোম্যাক আর্মির প্রধানের পদে বসিয়ে ছিলেন। কিন্তু ম্যাকলিন পোপা, বারণ-সাইড, হুক এবং মিডে—ওরা সবাই পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করে লিঙ্কনকে হতাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক লিঙ্কনের ঐ সব অপদার্থ পরাস্ত সৈনিকদের প্রতি যখন ঘৃণায় থুথু ছেটাচ্ছিল তখনও লিঙ্কন নিজের সিদ্ধান্তে ছিলেন অবিচল। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রিয় উক্তিটি মনে পড়ছে—যে জিনিষের বিচার করা সম্ভব নয় তাকে বিচারের বাইরে রাখাই উচিত।

যখন শ্রীমতী লিঙ্কন এবং অন্যানেরা দক্ষিণ দেশীয়দের সম্পর্কে কটূক্তি করছিলেন তখন লিঙ্কন জবাব দেন—ওদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। ঐ অবস্থা হলে আমরাও ঠিক ওদের মত আচরণ করতাম।

কিন্তু যদি কখনও সমালোচনা করার মত ঘটনা ঘটতো তাহলে লিঙ্কন তা করতে ছাড়তেন না। এখানে আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি—১৮৬২ শালের জুলাই মাসের প্রথম তিনটি দিনে গ্রেটিস—বার্গের বুকে রক্তক্ষয়ী লড়াই বেঁধেছিল। ৪ঠা জুলাই রাতে লীকে দক্ষিণ দেশ থেকে সরে আসতে হয়। রাতটা ছিল ঝড়ের হাওয়ায় ভরা ঈষান কোনে নামছিল কিছু বৃষ্টি পিয়াসী মেঘ, সমগ্র দেশের এখানে

ওখানে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে জমছিল কিছু অসন্তোষের ইশারা।

লী যখন তাঁর বিধ্বস্ত বাহিনী নিয়ে পোটোম্যাক নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর সামনে ছিল অগম্য নদীর উচ্ছ্বাস, তার পেছনে ছিল জাতীয় বাহিনী। লীকে ফাঁদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল। যে ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবার আশা ছিল সুদূর পরাহত।

লিঙ্কন সেটা বুঝতে পারলেন। এই সুযোগে যদি লীর সৈন্যকে অধিকার করা যায় তাহলে অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। তাই লিঙ্কন সেনাপতি মিডকে আদেশ করলেন যাতে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়ে লীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি তাঁর আদেশ পাঠালেন টেলিগ্রাফ করে এবং বিশেষ দূতের মাধ্যেমে ঐ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি নিজের কানে পৌঁছে দিলেন।

জেনারেল মিডে কি করলেন?

সম্মুখ সমরের পরিবর্তে তিনি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলেন। আসলে জেনারেল মিডে আক্রমণ করতে ভয় পেয়েছিলেন। অবশেষে পেটোম্যাক নদীর জল কমে গেল এবং লী তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদী পার হলেন।

মিডের চিঠি পড়ে লিঙ্কন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। এমন কি ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করতে বেশ কষ্ট হয় তাঁর। যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করবার এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হবার পর শোকে হতাশায় লিঙ্কন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলেন। পুত্র রবার্টকে ডেকে চীৎকার করে বললেন—হায় ঈশ্বর! এর মানে কি? হাত বাড়ালেই তাকে ধরতে পারতাম আর আমার জেনারেল তাকে ছেড়ে দিল! ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে জেনারেলের পিঠে চাবুক মেরে তার অপরাধের শাস্তি দিই।

গভীর হতাশার মধ্যে লিঙ্কন মিডেকে একটি চিঠি লেখেন। মনে রাখবেন, জীবনের এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে লিঙ্কন তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য্য হারান নি. ১৮৬২ সালে প্রকাশিত ঐ চিঠিতে লিঙ্কন লিখলেন—

আমার প্রিয় জেনারেল

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আপনি লীর পলায়ন থেকে উদ্ভূত দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে খুব আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। লীকে আমরা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছিলাম। হয়তো এই ঘটনা যুদ্ধের বুকে পরিসমাপ্তির রেখা টেনে দিত। কিন্তু এর ফলেই যুদ্ধটা আবার অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। যদি আপনি গত শনিবার লীকে আক্রমণ করতে ভীত হলেন তাহলে নদীর দক্ষিণ তীরে মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে আপনি কি করে ঐ বিরাট যুদ্ধ পরিচালনা করেন? আপনার উদাসীনতা ও অকারণ ভীরুতা আমাকে বিস্মিত করেছে। আপনার জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ ইতিমধ্যেই হাত ছাড়া হয়ে গেছে এবং তার জন্যে আমার হতাশার অন্ত নেই।

হে পাঠক, কল্পনা করুন, প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এই চিঠি পাবার পর জেনারেলের নিজের মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল? সে কথা আমরা কোনদিনই জানতে পারবো না। কেননা লিঙ্কন চিঠিটা পোস্ট করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ড্রয়ার থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়।

আমার অনুমান হল চিঠি লেখার পর লিঙ্কন হয়তো বাতায়ন পথে তাকিয়ে ছিলেন নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে। তারায় তারায় নিজের প্রশ্নের জবাব অন্বেষণ করছিলেন।

হয়তো তিনি মনে মনে বলছিলেন—মনে করি আমি যেন জেনারেল মিডে। হোয়াইট হাউস থেকে লিঙ্কনের আদেশ নিয়ে আমার কাছে এসেছে একটি চিঠি। আমি কি অত তাড়াতাড়ি মনস্থির করতে পারবো? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন যদি এই চিঠিটা আমি পাঠাই তাহলে মিডে আমার সম্পর্কে ভুল ধারনা করবেন এবং হয়তো তিনি রাগে দুঃখে আর্মি থেকে পদত্যাগ করবেন। তার মানে কমাণ্ডার হিসেবে তাঁর যে নিজস্ব ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকা থেকে দেশ হবে বঞ্চিত।

এই ভেবে লিঙ্কন চিঠিটা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলেন। কেননা নিজের জীবনের তিক্ত ঘটনা থেকে তিনি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যে, সমালোচনার অন্তিমে অকারণ তিক্ততা নেমে আসে।

থিওডোর রুজভেল্ট বলেছেন—প্রেসিডেন্টের পদে থাকবার সময় যখনই আমার সামনে একটি কঠিন সমস্যা এসে উপস্থিত হত তখন আমি আমার ডেস্কের সামনের দেওয়ালে টাঙানো লিঙ্কনের বিরাট ছবিটার দিকে তাকাতাম। ভাবতাম যদি তিনি আমার জায়গায় থাকতেন তাহলে কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করতেন?

আমার কৈশোর দিনে আমি রিচার্ড হারডিং ডেভিস নামে এক গ্রন্থকারকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। একদা উনি আমেরিকার সাহিত্য জগতকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। আমি তখন লেখকদের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনার কাজে ছিলাম ব্যস্ত এবং ডেভিসের কাছে তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি একটি চিঠি পাই যার তলায় লেখা ছিল এই কটি কথা—শ্রুত হয়েছে, পঠিত হয় নি।

ঐ উক্তিতে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই। আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐ লেখক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্মব্যস্ত মানুষরূপে প্রতিভাত হন। আমিও তাই আমার রচনার শেষে ঐ শব্দকটি বসাই।

ডেভিস কিন্তু আমার চিঠির উত্তর দেন নি। তিনি তার তলায় একটি মন্তব্য করে সেটি ফেরত পাঠিয়ে দেন—তোমার রুচিহীন ব্যবহারের জবাবে আমি শুধু পাঠাতে পারি অভদ্র ব্যবহার।

হয়তো আমি নিন্দার যোগ্য ছিলাম। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজের দোষ ত্রুটিকে আমিও মেনে নিলাম না। এমনকি দশ বছর বাদে যখন রিচার্ড হারডিং ডেভিসের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেলাম তখন আমার মনে এক বিচিত্র আনন্দ দেখা দেয়।

সমালোচনা যে কত ভয়ংকর হতে পারে তার অনেক উদাহরণ আছে। প্রচণ্ড সমালোচনার চাপে পড়ে ইংরেজী সাহিত্যের সর্বকালের এক স্মরণীয় ঔপন্যাসিক টমাস হারডি জীবনের মত গল্প লেখার সাধনা

দিলেন ছেড়ে। এই সমালোচনাই বৃটিশ কবি টমাস চ্যাটারটনকে আত্ম-হত্যা করতে বাধ্য করে।

*　　　*　　　*

যৌবনে যিনি ছিলেন বলগাহীন উদ্দাম—সেই বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনকে পাঠানো হল ফরাসী দেশে, আমেরিকার দূত করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে বেনজামিনের সাফল্যের গোপন চাবি কোথায় ?

তাঁর ভাষায় - আমি কোন মানুষেব সমালোচনা করি না। আসলে যার সঙ্গে দেখা হয়, মনে হয় তার তুলনায় আমি কত সাধারণ।

নির্বোধরা সমালোচনা করে, অভিযোগ করে আর দোষারোপ করে।

কিন্তু মানুষকে বুঝতে হলে এবং তার দোষ ক্রুটি ক্ষমা করতে হলে প্রয়োজন সুদৃঢ় চরিত্র আর আত্মসংযমের।

বিশিষ্ট প্রবন্ধকার কারলাইল বলেছেন—মহান মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় সাধারণ লোকের সঙ্গে হৃদ্যতা পূর্ণ ব্যবহারে।

আসুন, আমরা অভিযোগ করার বিচিত্র স্বভাব ত্যাগ করি, বুঝতে চেষ্টা করি। এর থেকে সহানুভূতি, ঔদার্য্য আর দাক্ষিণ্য জন্ম নেবে।

কেননা সকলকে জানার অর্থ হল সকলকে ক্ষমা করা।

তাছাড়া ডকটর জনসন মন্তব্য করেছেন—স্বয়ং ঈশ্বরও বোধ হয় মানুষকে এখনোও ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি

যে কাজ ভগবানের অসাধ্য, সেখানে আপনার আমার সাফল্য আসবে কি ?

নবম অধ্যায়

জনসংযোগের গোপন কথা

মানুষকে আপন করার একটি মাত্র পথই আছে, যেটা এখন আমি আপনাদের কাছে বলতে চলেছি।

ভিয়েনার সুবিখ্যাত ডকটর সিগমণ্ড ফ্রয়েড হলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্বিক। তিনি বলেছেন মানুষের সমস্ত ইস্থাশক্তির অন্তরালে দুটি ধারণা কাজ করে। একটি হল, যৌন কেন্দ্রিক বাসনা এবং অন্যটি মহত হবার ইচ্ছা।

আমেরিকার সুখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক জন ডিউএ অন্য দৃষ্টি কোণ থেকে এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মানবীয় মানসিকতার গভীরতম আকাঙ্খা হল নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। এই বাক্যটি মনে রাখুন—নিজেকে গুরুত্বপুর্ণ করা।

কোনদিন কি মনে হয় না যে জীবন অথবা সমাজের কাছে অথবা এই পৃথিবীর কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করেন ?

প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন সাধারন মানুষ নিশ্চয় মনে মনে এই আটটি বিষয় আকাঙ্খা করে—

এক। **সুস্বাস্থ্য এবং নীরোগ দীর্ঘ জীবন।**
দুই। **খাদ্য।**
তিন। **বিশ্রাম ও নিদ্রা।**
চার। **অর্থ এবং অর্থের দ্বারা ক্রত দ্রব্যাদি।**
পাঁচ। **সুখী জীবন।**
ছয়। **যৌন আনন্দ।**
সাত। **সন্তান সন্ততিদের সুখ সমৃদ্ধি।**
আট। **নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি।**

এই সবকটি ইচ্ছা হয়তো পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু শেষতম আকাঙ্খাটি হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে থাকে।

লিঙ্কন একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—সকলেই প্রশংসা চায়। উইলিয়ম জেমস মন্তব্য করেন—মানুষের প্রধান ধর্ম হল প্রশংসা অর্জন করা।

এটাকে এক অসংযমী মানবিক ক্ষুধা বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে এমন মানুষ খুব কমই আছেন. তিনি এই ইচ্ছাটিকে পুরোপুরি শাসন করতে পেরেছেন। যিনি পেরেছেন তিনি সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর করতলে বন্দী করার স্পর্ধা রাখেন।

এই কামনাই মানুষকে জন্তুদের চেয়ে পৃথক করেছে।

কয়েকটা উদাহরণ দিই। যখন আমি ছিলাম মিশৌরীর গ্রাম্য বালক এটা হল সেই সময়কার ঘটনা। তখন আমার পিতা এক বিরাট খামারের মালিক ছিলেন এবং তাঁর পশুশালায় ধবধবে সাদা রঙের গরুর পাল ছিল। গ্রাম্য মেলায় তিনি প্রথম পুরস্কার জয় করতেন। আমার বাবা পড়তেন সাদা মসলিনের জামা। যাতে বন্ধু বান্ধবরা বা আত্মীয়েরা তারিফ করে। এমন ভাবে সেই শৈশব থেকে আমি জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।

আসুন, এবার সভ্যতার দিকে তাকিয়ে দেখি। যদি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আত্ম সচেতনতার মধ্যে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের উদ্বুদ্ধ না করতেন, সভ্যতা তা হলে শৈশবে মুখ থুবড়ে পড়তো।

এই অতৃপ্ত বাসনাই ডিকেন্সকে কালজয়ী উপন্যাস রচনার অনুপ্রাণীত করেছিল। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তিই স্যার ক্রিশটোফার রেনকে করে তোলে মহান সঙ্গীত সাধক এবং এই আকাঙ্খা রকফেলারকে কোটিপতিতে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, আপনার প্রতিবেশী এই তাড়নায় বিরাট একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে বসে।

এই বাসনাই আপনাকে নিত্য নতুন ফ্যাসানে সাজতে উদ্বুদ্ধ করে, আনকোরা নতুন গাড়ীটি চালাতে বাধ্য করায়, আর নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে রাশি রাশি মিথ্যে কথা বলায়।

এই আকাঙ্খাই একজন বালককে শয়তান করে তোলে। নিউইয়র্কের

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের মতে আজকের দিনের যে কোন তরুন ক্রিমিন্যাল হিসাবে সংবাদপত্রের পাতায় নিজের নাম দেখার দুরন্ত অভিলাষে আইন ভাঙে। যে জানে না ইলেকট্রিক চেয়ারের পথ কতদূর। তার চোখে শুধু ভাসে রুথ, লাকুভারভিয়া আইনস্টাইন, লিণ্ডবার্গ, টেকমাস ও রুশ ভালজের ছবি।

আপনি যদি আমাকে আপনার এই গোপন বাসনার কথা বলেন তাহলে আমি বলে দেব আপনি কি হতে চান। এর থেকে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। জন ডি রকফেলার চীন দেশের পিকিং শহরে একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরী করার জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার দান করেছেন। যে সমস্ত দরিদ্র লোকেদের সঙ্গে তাঁর কোনদিন দেখা হবে না তাদের জন্যে কেন তাঁর এই দাক্ষিণ্য ?

অপর পক্ষে ডিলিংজার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে নিজের গুরুত্ব বাড়াতে চেয়েছিল। যখন পুলিশের লোকেরা তাকে ধরে ফেলে তখন সে মিনে—সোটার এক আমার বাড়িতে বসে সদর্পে ঘোষণা করেছিল – আমার নাম ডিলিংজার ! আমি জনগণের এক নম্বর শত্রু।

রকফেলার আর ডিলিংজারের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল তাদের মানসিকতার তফাৎ। দুজনেই কিন্তু জনগনের চোখে বড় হতে চেয়েছিল।

ইতিহাস বলে, বিখ্যাত ব্যক্তিরা নাকি আত্মযশের জন্য উন্মাদ হয়ে পড়ে। এমন কি জর্জ ওয়াশিংটন পর্যন্ত নিজের নামের আগে “মহামান্য মহাশয়, ইউনাইটেড স্টেট্সের প্রেসিডেন্ট” এই খেতাবটি শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। কলম্বাস নিজেকে জাহির করতেন “অ্যাডমিরাল অফ দি ওসান অ্যাণ্ড ভাইসরয় অফ ইণ্ডিয়া” রূপে। যে সমস্ত চিঠিতে ক্যাথেরিনকে “হার ইমপেরিয়াল ম্যাজেষ্টি” রূপে সম্বোধন করা না হত সেইসব চিঠি তিনি নাকি পড়তেন না।

হোয়াইট হাউসে থাকবার সময় মিসেস লিঙ্কন একদা মিসেস গ্রানটের ওপর অত্যন্ত রেগে যান এবং ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত চীৎকার

করে বলেন আপনাকে আমিতো আমন্ত্রণ জানাইনি। আপনি কি করে আমার সামনে বসবার সাহস পেলেন ?

আমাদের লক্ষপতিরা অ্যাডমিরাল বারডের এই শর্তে অভিযানে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল যে অ্যান্টার্কটিকার বুকে যে সমস্ত অনামা তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গ আছে সেগুলি তাদের নামে অলঙ্কৃত করতে হবে বলে। ভিক্টর হুগো চেয়েছিলেন যে তাঁর সম্মানার্থে প্যারিস সহরের যেন নতুন নামকরণ করা হয়। এমন কি সেক্সপীয়রও নিজের সম্মান বাড়াবার জন্য কম আকাঙ্খিত ছিলেন না।

অনেক সময় আমরা অন্যের সহানুভূতি আর আক্রমণ বাড়াবার জন্যে পঙ্গুত্বের অভিনয় করি এবং এমন ভাবেই মনে মনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করে প্রীত হই। যেমন ছিলেন মিসেস ম্যাকার্থার। তিনি তাঁর স্বামী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে এমনভাবে বশীভূত করেন যে প্রেসিডেন্ট তার সরকারী সমস্ত কাজ বাতিল করে মিসেসের পাশে বসে থাকতেন। তিনি শ্রীমতীকে ঘুম পাড়াতেন। এমন কি কোথাও যাবার দরকার হলে শ্রীমতী তার সাহায্য ছাড়া চলতে পারতেন না।

রোজ মেরী ক্যাস্‌ল একদিন আমাকে এক যৌবনা স্বাস্থ্যবতী রমণীর গল্প বলেছিল যে নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে। এখন তার দিন কাটছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। দশ বছর ধরে তার বৃদ্ধা মা তাকে পরিচর্যা করে চলেছে।

অনেকে বলে থাকেন যে উন্মাদনার অভিনয় করতে করতে মানুষ নাকি সত্যি সত্যি উন্মাদ হয়ে যায়।

এই বক্তব্যের অন্তরালে চিকিৎসকদের সম্মতি মিলেছে। আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে যত বেশী মানসিক রোগীর ভিড় হয়, এত ভিড় আর অন্য কোন বিভাগে দেখা যায় না।

কিন্তু এর কারণ কী ?

এর সঠিক কোন কারণ আজও জানা যায়নি। তবে আমরা জানি সিফিলিসের মত রোগ হলে তা মাথার কোষকে ধ্বংস করে দেয়, এর

ফলে উন্মাদ অবস্থা দেখা দেয়। আসলে মানসিক রোগের অর্ধেক আসে এই ধরনের শারীরিক ক্ষতি থেকে। এর মধ্যে আছে মস্তিস্কের কোষের বিকৃতি, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন, টকসিনের প্রভাব এবং শারীরিক আঘাত।

অথচ বাকী অর্দ্ধেক মানুষ তাদের মস্তিস্কের কোষগুলিকে সুস্থ আর সজীব রেখেই মানসিক ব্যাধির কবলে পড়ে। পোস্ট মর্টেম পরীক্ষায় তাদের মাথার স্নায়ুগুলিকে অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা আপনার আমার মাথার স্নায়ুর মত স্বাস্থ্যপ্রদ।

তাহলে মানসিক বিকৃতির কারণ কি?

সম্প্রতি আমি এ প্রশ্ন নিয়ে এক বিখ্যাত মনোস্তত্ববিদের কাছে যাই। তিনি মাসসিক বিকৃতির ওপর গবেষণা করে সর্বোচ্চ সম্মান ও দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনিও সঠিকভাবে বলতে পারলেন না যে এদের উন্মাদ হবার কারণ কী? আসলে আমরা অনেক সময় বেশী স্বপ্ন দেখি। কিন্তু এই পৃথিবী আমাদের সেই সুন্দর স্বপ্নগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে একটি সুন্দর গল্প শোনালেন।

তাঁর ভাষাতেই বলি···এ হল আমার এক পেশেন্টের গল্প, যার জীবনে বিবাহ বয়ে এনেছে অনন্ত ট্র্যাজেডি। সে স্বামীর কাছ থেকে চেয়েছিল বুক ভরা ভালবাসা, যৌন তৃপ্তি, সন্তান সন্ততি আর সামাজিক সম্মান, কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর সমস্ত আকাঙ্খাকে নিহত করেছে। কিন্তু বিবাহিত স্বামী তাকে ভালবাসে না। এমন কি তার সঙ্গে একসঙ্গে বসে ডিনার খায় না। মেয়েটির কোন সন্তান হয় নি। সামাজিক সম্মান বলতে কিছুই ছিল না তার।

··এমন ভাবে ধীরে ধীরে সে উন্মাদ হয়ে যায়। তার কল্পনার মধ্যে দেখে যে সে তার স্বামীকে ডির্ভোস করে কুমারী অবস্থায় ফিরে গেছে। এর পরে সে ভাবতে শুরু করে তার সঙ্গে এক অভিজাত

পুরুষের বিয়ে হয়েছে, এমন কি নিজেকে সে লেডি হিপার বলে পরিচয় দেয়।

যেহেতু মেয়েটির কোন সন্তান ছিল না অথচ মনে মনে সে মা হবার ইচ্ছে পোষণ করত, তাই সে ভাবতে শুরু করে সে যেন নতুন সন্তানের জন্ম দিচ্ছে।

জীবন তার সমস্ত স্বপ্নালু জাহাজ গুলোকে কঠিন বাস্তবতার ডুবো পাহাড়ে ধ্বংস করেছে। কিন্তু উন্মাদনার সূর্য তৃপ্ত আশ্চর্য দ্বীপের উপর একা দাঁড়িয়ে সে মুক্ত বিহঙ্গের গান শুনতে চাইছে।

...আমার কি মনে হয় জানেন, আমার মনে হয় বেচারী যেন সারাটি জীবন তার এই মানসিক বিকৃতির মধ্যে থাকতে পারে। এই অবস্থায় যে আনন্দ সে পাচ্ছে, জীবন তাকে তো কোনদিন সে আনন্দ দেবে না।

আসলে উন্মাদ লোকেরা আপনার আমার চেয়ে অনেক আনন্দিত থাকে। তারা ইাচ্ছমত তাদের সমস্যা সমাধান করে ফেলে। ইচ্ছে হলে তারা আপনাকে দশ লাখ ডলারের চেক লিখে দেবে অথবা আগা খানের কাছে পাঠিয়ে দেবে, তারা তাদের স্বনির্মিত যে স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা সেখানে তাদের সমস্ত কোমল ইচ্ছাগুলি শত দলের মত পাপড়ি মেলে।

আমি যতদূর জানি পৃথিবীর মাত্র দুজন মানুষ বছরে দশ লক্ষ ডলারের বেশী বেতন পেয়েছেন। এঁদের একজন হলেন ওয়ালটার উইলিস, অন্যজন চার্লস বেকার।

অ্যানড্রু কারনেগি কেন চার্লস বেকারকে বছরে দশ লাখ ডলার বেতন দিতেন? চার্লস আদৌ একজন প্রতিভাশালী মানুষ ছিলেন না। তাহলে তিনি কি ইস্পাত উৎপাদনের ব্যাপারে সবকিছু জানতেন? তাও নয়। চালর্স নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে তাঁর অধীনে এমন অনেক লোক কাজ করে যাদের জ্ঞান তাঁর চেয়ে বেশী।

তবে?

চার্লসকে এই অভাবিত অর্থ দেওয়া হত শুধু তাঁর জনসংযোগের

আশ্চর্য ক্ষমতার জন্য। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যে এই গুণটি তিনি কিভাবে আয়ত্ব করলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে চার্লস খুব দামী কথা বললেন। আমার তো মনে হয় যে চার্লসের কথাগুলি ব্রোঞ্জেও খোদাই করে প্রতিটি বাড়ীতে আর বিদ্যালয়ে, দোকানে আর অফিসে টাঙিয়ে রাখা উচিত। যাতে বাচ্চারা ল্যাটিন ক্রিয়ার রূপ অথবা ব্রাজিলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মত অনর্থক ব্যাপারে মাথা না খাটিয়ে সেটি মনে রাখতে পারে।

চার্লসের উক্তিটি ছিল ঠিক এই রকম—আমি মানুষের মনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করি। আমার স্বভাবের বিরলতম গুণ হল মানুষকে তার গোপন শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করে তোলা।

…অন্যের সমালোচনা আমাদের উচ্চাশাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে। আমি কখনো কাউকে সমালোচনা করি না। বরং মানুষকে আমি কাজের উৎসাহ দিই। এটাই আমার জনপ্রিয়তার গোপন কারন।

এই মতবাদে বিশ্বাস করতেন বলে বেকাব আজ সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঠিক এর উল্টো মনোভাব পোষণ করেন।

অ্যানড্রু কারনেগির মানোভাব আমাকে বিস্মিত করেছে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর পরেও জনপ্রিয়তার ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে চান। নিজের স্মৃতি সৌধে যে শিলালেখা লিপিবদ্ধ হবে তা তিনি আগে থেকেই তৈরী করেছেন। এটি হল এইরকম - এখানে শায়িত আছেন এমন এক মানবসত্ত্ব, যিনি তাঁর চেয়ে বিশিষ্ট সঙ্গীসাথীদের ভালবাসা অর্জন করার কৌশলটি জানতেন।

রকফেলার জানতেন যে কিভাবে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সুসংম্পর্ক বজায় রাখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি চরমতম সমস্যার দিনেও নিজেকে সংযত রাখতে পারতেন। এটা হল মানব চরিত্রের বিরলতম ক্ষমতা।

একদা আমি ছটি দিন অনশনে ছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল ব্যাপারটা বুঝি সাংঘাতিক। কিন্তু ক্রমশঃ খিদের ব্যাপারটা কমে গেল। দ্বিতীয় রাতে আমি যতটা ক্ষুধার্ত ছিলাম তার চেয়ে অনেক কম ক্ষুধার্ত ছিলাম ষষ্ঠ রাতে। অনেকে একথা ভেবে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে আমরা কেন খাদ্য অন্বেষণে যে কোন রকম কাজ করি আমার মনে হয় কিছু না খেয়ে ছদিন কাটালে যে ক্ষতি হয় তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে যদি কেউ ছয়টি সপ্তাহ কঠোর দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনকাটায়।

কালচার ত্ব ইনভিয়েনা নামক থিয়েটারে অ্যালফ্রেড যে উক্তিটি করেছিলেন সেটা আমার মনের মধ্যে জেগে আছে, তিনি বলেছিলেন—আমার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হল আত্মসম্মান অর্জন করা।

আমরা আমাদের সন্তান সন্ততি আর বন্ধুবর্গ ও অধীনস্থ কর্মচারীদের শারীরিক পুষ্টির ব্যাপারে সবসময় মাথা ঘামিয়ে থাকি, কিন্তু আমরা মানসিক পুষ্টির কথা চিন্তাই করি না। শক্তি অর্জন করার জন্যে আমরা তাদের মুখে রুটি তুলে দিই, কিন্তু প্রশংসার যে ছন্দিত শব্দগুলো তাদের স্মৃতির আকাশে শুকতারার মত জ্বলতে থাকবে, সেগুলো আমরা দিই না।

* *

ব্রডওয়ে থিয়েটারকে যে মানুষটি নিজের ব্যক্তিত্ব প্রভায় উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর নাম জিকফেল্ট। তিনি কেমন করে এই অসাধ্য সাধন করলেন? এর উত্তরে বলতে হয় যে জিকফেল্ট মার্কীন ললনাদের যথাযথ সম্মান দেবার কৌশলটি জানাতেন। প্রতি বছর তিনি অতি সাধারণ মেয়েদের মধ্যে থেকে দু একটিকে সযত্নে চয়ন করতেন তাঁর থিয়েটার উত্থানের জন্যে। কিছুদিনের মধ্যে তারা রহস্যময় সৌন্দর্য্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়াত। তিনি অভিনেত্রীদের হৃদয়ের নিভৃতে প্রবেশ করে তাদের উৎসাহ দিতেন।

বাস্তব বুদ্ধির উন্মেষে জিকফেল্ট কয়েকটি প্রশংসনীয় কাজ করে

গেছেন। যেমন রাতারাতি তিনি কোরাস মেয়েদের সাপ্তাহিক বেতনের পরিমান ত্রিশ ডলার থেকে বাড়িয়ে একশো পঁচাত্তর ডলার করে দিলেন। শুধু তাই নয় মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানোর ব্যাপারে জিকফেল্টের জুরি মেলা ভার। যে কোন ছবির প্রথম রজনীর শেষে তিনি প্রত্যেক অভিনেত্রীর কাছে শুভেচ্ছা সূচক টেলিগ্রাম পাঠাতেন। আর অভিনয় স্থরু হওয়ার আগে প্রতিটি কোরাস গায়িকার হাতে তুলে দিতেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম গোলাপের পাপড়ি।

* * *

আমি জানি আমার পাঠকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা ভুরু কুঁচকে ভাবতেন—শুধু প্রশংসায় কি আর সাফল্যের বাগানে ফুল ফোটে ?

অবশ্য আমি স্বীকার করি যে ভেতরে কোন গুণ না থাকলে শুধু হাততালিতে উন্নতি হয় না। কিন্তু হাততালি না পেলেও মানুষ বড় হতে পারে না। পাশাপাশি এ কথা সত্যি যে কিছু মানুষ এমন ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণিত যে তারা সামান্য প্রশংসার লোভে নিজের সত্বাকে সস্তাদামে বিকিয়ে দিতে পারে। অনাহারে কাতর মানুষ যেমন ভাবে ঘাসপাতা আর কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করে, এও অনেকটা সেইরকম ব্যাপার।

এ্যাস্‌লে ভায়েরা বিয়ের বাজারে অবিশ্বাস্য নাম কিনেছে। কিন্তু তথাকথিত যুবরাজদের এই নারী ভাগ্যের আসল কারন কি ? কেমন করে তারা দুই তিলোত্তমা স্থন্দরী ও রূপোলী জগতের মক্ষিরানীকে শয্যা সঙ্গিনী করল এবং বিশ্ব বিখ্যাত বিত্তশালিনী বারবারাকে অর্ধাঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করলো ?

ক্লারা জোহান্‌স "ফ্রীডম" কাগজে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেছেন —মেয়েদের কাছে এ্যাস্‌লেদের যা আকর্ষণ তার সঙ্গে যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত রহস্যের তুলনা হতে পারে।

পোলা নেগরি নামে এক জগত বিখ্যাত শিল্পী আমায় বলেছিলেন যে

এ্যাসলে ব্রাঁদার্স যেভাবে মেয়েদের কাছে প্রেম নিবেদন করে তা অসাধারণ। বাকচাতুর্য্যের যে সুক্ষতম জালে, স্মিতহাসি ঈষৎ স্পন্দিত রেখায় এবং মৃদু সম্ভাষণের আধো আধো আকর্ষণে তারা যে স্বপ্ন কুহক সৃষ্টি করে তার থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

এমন কি মহারানী ভিক্টোরিয়াও নিজের প্রশংসা শুনতে ভাল বাসতেন। অবশ্য নকল টাকার মত প্রশংসাও নকল হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটু সাবধান হতেই হবে!

সৎ প্রশংসা আর উদ্দেশ্য মূলক যোগাযোগের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে।

প্রথমটিকে আন্তরিক হতে হবে, দ্বিতীয়টি হবে কৃত্রিম। প্রথমটির উৎস হল, হৃদয়ের নির্জন প্রান্তর, দ্বিতীয়টি আসে দাঁতের ফাঁক থেকে। প্রথমটি স্বার্থ বিহীন, দ্বিতীয়টি স্বার্থ সমন্বিত। প্রথমটি যেখানে বিশ্বজনীন স্বীকৃত পেয়েছে, দ্বিতীয়টি সেখানে লাভ করেছে সকলের সীমাহীন ঘৃণা।

কিছুদিন আগে আমি মেকসিকো সিটিতে বেড়াতে যাই। সেখান-কার একটি প্রাসাদে জেনারেল অবরেগণের আবক্ষ মূর্ত্তি দেখলাম। মূর্তির তলায় লেখা আছে জেনারেলের জীবন দর্শন থেকে নেওয়া কটি অমূল্য সম্পদ—যারা তোমার শত্রু, যারা তোমায় আঘাত করে, তাদের সম্বন্ধে ভয় নেই। যারা তোমার বন্ধু, যারা তোমায় তোষামোদ করে, তাদের থেকে দূরে থেকো।

এমারসন বলেছেন—যে সমস্ত মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি তারা কোন না কোন দিকে বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। আমি তাদের কাছ থেকে সেই গুণগুলি অর্জন করার চেষ্টা করেছি।

আসুন আমরা আমাদের বিশিষ্ঠতা অথবা ত্রুটির কথা ভুলে যাই, আমরা অন্যের চরিত্র থেকে গুণগুলি চয়ন করি। আর তোষামোদকে উপেক্ষা করে আন্তরিক প্রশংসা করার চেষ্টা করি। তাহলে দেখবেন জীবনটা আপনার স্মরণীয় হয়ে উঠবে।

"দশম অধ্যায়"

কর্মঠ লোকের পায়ের নীচে পৃথিবী। কর্মহীনকে নির্জনপথে চলতে হয়।

প্রতিবছর গরমের সময় আমি মাছ ধরতে যাই। মাছের চার হিসেবে স্ট্রবেরী আর ক্রীম হল আমার প্রিয় উপাদান। কিন্তু মাছেরা পোকা মাকড় পছন্দ করে। তাই মাছ ধরার সময় আমি আমার ভাল লাগার কথা ভুলে গিয়ে মাছেদের পছন্দের কথা ভাবতে থাকি আর বঁড়শির আগায় গেঁথে নি গঙ্গাফড়িং অথবা ঘাস পোকা। তারপর ফিস ফিস করে বলি—কি, এবার তোমরা প্রিয় খাদ্যের টানে কাছে আসবে তো?

মানুষ শিকারের সময় আমরা যদি এই সরল সত্যটাকে মনে রাখতে পারি তাহলে অনেক সমস্যা অঙ্কুরেই মিটে যাবে।

এমনভাবেই স্যাম ইভান্স আমাদের স্মৃতির মধ্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। যেখানে তাঁর যুদ্ধকালীন সহকর্মীরা—উইগার্স, রোল্যাণ্ডো, প্লিমেসসো প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। সেখানে তিনি এখনও নিজের জনপ্রিয়তাকে বজায় রেখেছেন।

এর অন্তরালে আমার মাছ ধরার তত্ত্ব কাজ করছে। স্যাম ইভান্স সব সময় অন্যের চিন্তা ভাবনার গুরুত্ব দিতেন।

নিজেদের সুখ সুবিধা নিয়ে ভাবনা করার ব্যাপারটা শিশু সুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কেননা মানুষ তো তার নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাববেই। তাতে আর অবাক হবার কি আছে?

অন্যের সুখ সুবিধার প্রতি আমরা কতটা নজর দিতে পারি এবং নিজেদের স্বভাব চরিত্রকে কতখানি অন্যের উপযোগী করে তুলতে পারি, তাই হল জীবনের বড় কাজ।

মনে করুন বাবা হিসেবে হয়তো আপনি চান যে আপনার ছেলের ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট থাকবে না। তাহলে আপনি যদি ছেলেকে উপদেশ দেন বা তার ওপর খবরদারী করার চেষ্টা করেন, সে কিন্তু

মোটেই তার অভ্যেস ছাড়বে না। এক্ষেত্রে আপনাকে অন্যভাবে কাজ করতে হবে। আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে ধূমপানের ফলে ভবিষ্যত জীবনে ছেলেটি বেস্‌বল খেলতে পারবে না অথবা ১৩০ মিটার দৌড়ে যোগ দিতে পারবে না।

এমনভাবে কৌশলে আমাদের ব্যক্তিত্বকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। এ কথাটা সকলের ক্ষেত্রেই সত্যি।

প্রফেসার হেনরীর লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে—মানবীয় সম্পর্কের প্রভাব। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন—আমরা প্রাথমিক ভাবে যেটা আকাঙ্ক্ষা করি, সেটাই কর্মরূপে দেখা দেয়! বাড়ীতে, ব্যবসায় অথবা রাজনীতি কিংবা বিদ্যালয়ে আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে অন্যের মতামতের যথেষ্ট মূল্যায়নের ওপর।

অ্যানড্রু কারনেগি ছিলেন একজন দারিদ্র্য নীপিড়িত স্কচ বালক। যিনি ঘণ্টা প্রতি দু'সেণ্ট হিসেবে জীবিকা সুরু করে তিনশো পয়ষট্টি মিলিয়ান ডলার রোজগার করেছিলেন। মাত্র চার বছর তিনি বিদ্যালয়ে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেন! কিন্তু তার মধ্যেই জনসংযোগের জটিল কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

এখানে তাঁর জীবনের একটি মজার ঘটনার কথা বলছি। তাঁর ছোট শালী দুটি দুষ্ট বাচ্চাকে নিয়ে বড়ই বিপদের মুখে পড়ে। ছেলেদুটিকে সে হোস্টেলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা এতই চঞ্চল যে মায়ের চিঠির জবাব দিত না। শালীর মুখে এই সংবাদ পেয়ে কারনেগি একটা ফন্দি করলেন। তিনি শালীর সঙ্গে বাজী ফেললেন যে দু-তিন দিনের মধ্যে ছেলেদের চিঠি জোগাড় করবেন। একশো ডলার বাজি ধরা হল। তারপর কারনেগি ছেলেদুটিকে এই বলে চিঠি দিলেন যে, চিঠির সঙ্গে তাদের পাঁচ ডলার করে পাঠানো হল।

তিনি কিন্তু সত্যি সত্যি টাকাটা পাঠালেন না।

পরের দিনই ডসের চিঠি এসে হাজির। কারণটা আশা করি আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন?

এটাই ছিল কারনেগির আশ্চর্য ক্ষমতা।

*   *   *

কোন কাজ শুরু করার আগে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে সেই কাজের প্রতি অন্যের আকর্ষণ কতটা বাড়ানো যেতে পারে। আমার জীবনে এমন অনেক অনেক মজার ঘটনা আছে। যার থেকে এ সম্পর্কে আমি প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। তার থেকেই একটা আপনাদের শোনাচ্ছি।

একবার আমি ক্যালিফোর্নিয়ার কোন একটি হোটেলের বলরুমটি কুড়িটি রাতের জন্য ভাড়া করি। কোন একটি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্যে।

শুরুর মুখে হঠাৎ আমাকে বলা হল যে তিনগুণ বেশী ভাড়া দিতে হবে।

ইতিমধ্যে টিকিট ছাপা হয়ে গেছে। শ্রোতাদের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে টিকিট।

আমি তো ভীষণ বিপদে পড়লাম।

কদিন বাদে আমি ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে গেলাম।

তাকে বললাম—আপনার চিঠি পেয়ে আমি মর্মাহত হয়েছি। কিন্তু তার জন্যে আপনাকে দোষারোপ করতে পারছি না, কেননা আপনার জায়গায় থাকলে আমিও হয়তো এমন চিঠি দিতে বাধ্য হতাম। ম্যানেজার হিসেবে আপনার দায়িত্ব হল লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে যাওয়া। তা না করতে পারলে আপনাকে বরখাস্ত করা হবে।

এখন যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমাকে একটা কাগজ দিন। তাতে আমি এই হলের সুবিধে আর অসুবিধেগুলো লিখব।

আমি ম্যানেজারের দেওয়া কাগজের মাঝামাঝি একটি লাইন টেনে কাগজটিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করলাম। একদিকে সুবিধাগুলি লিখবো অন্যদিকে থাকবে অসুবিধাগুলি।

সুবিধা শ্রেণীর নীচে লিখলাম “বিনা ভাড়ায় বলরুম”। এটা হবে

একটা বড় সুযোগ। আমি যদি কুড়ি রাতের জন্যে বল রুমটি আটকে রাখি তাহলে আপনার অর্থ ক্ষতি হবে।

এবারে অসুবিধাগুলো দেখা যাক। ম্যানেজার হিসেবে আপনার কর্তব্য হল আমার কাছ থেকে আয় বাড়ানো। তার বদলে আপনি আয় কমাবার চেষ্টা করছেন। কেননা ভাড়া হিসেবে যে পরিমান অর্থ আপনি দাবী করছেন তা মেটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই অন্য কোন হল আমাকে ভাড়া নিতে হবে।

আর একটি অসুবিধা আছে। এই বক্তৃতা শুনতে সহরের শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের সমাবেশ হবে, তারা আপনার হোটেলের বিজ্ঞাপনের কাজ করবে। সত্যি বলতে কি পাঁচ হাজার ডলার খরচ করে কোন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও এত লোককে আপনি জড় করতে পারবেন না।

এইভাবে আমি কাগজটি ভর্তি করে ম্যানেজারের হাতে সেটি তুলে দিলাম। বললাম—আশা করি আপনি সুবিধে-অসুবিধেগুলো ভালো-ভাবে বিবেচনা করবেন। তারপর ভেবেচিন্তে আপনার চূড়ান্ত মন্তব্য জানাবেন।

পরের দিনই আমি তার চিঠি পেলাম। তিনি মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করেছেন।

একটা বিষয় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে আমি কিন্তু ম্যানেজারকে একবারও আমার ভাড়া কমাবার কথা বলিনি। আমি শুধু তাঁর দৃষ্টি কোণ থেকে সমস্যার বিচার বিবেচনা করতে চেয়েছি মাত্র।

এর বদলে যদি আমি রেগে তাঁর অফিসে প্রবেশ করে বলতাম—কি ভেবেছেন আপনি? টিকিট ছাপা হয়ে গেছে। টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে? আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? একেবারে তিনগুণ ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন? ভাড়া আমি দিতে পারব না?

তাহলে কি হত?

শুরু হত তর্ক বিতর্ক। যার পরিসমাপ্তি ঘটত উত্তপ্ত বাদানুবাদে।

হয়তো তিনি আমার বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝতে পারতেন। কিন্তু আমার কাছে নতি স্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

মানবিক সম্পর্কের সুক্ষ্ম কারুকাজের বিষয় হেনরী ফোর্ড যে কথা বলেছেন আমি তার প্রতিধ্বনি করছি—সাফল্যের গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক অনুধাবনের ওপর।

এই উক্তিটি এতই সরল সত্য যে এক নজরে যে কেউ তা অবলোকন করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল পৃথিবীর নব্বই শতাংশ লোক তাদের জীবনের নব্বই শতাংশ সময় এটা একেবারে ভুলে যায়?

উদাহরন চাই?

তাহলে আগামীকাল সকালে আপনার ডেস্কে যে সমস্ত চিঠি আসবে সেগুলো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন তাহলেই দেখবেন যে তাদের অধিকাংশ এই সাধারণ কৌশলটুকু রপ্ত করতে শেখেনি।

মনে করুন কোন এক বিজ্ঞাপন সংস্থার রেডিও বিভাগের প্রধান একটি চিঠি লিখেছেন। আরও মনে করুন যে ঐ সংস্থাটি সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। এই চিঠিটি স্থানীয় রেডিও স্টেশনের ম্যানেজারের কাছে পাঠানো হল।

প্রত্যেকটি বক্তব্যের নীচে আমি আমার প্রতিক্রিয়ার কথা লিপিবদ্ধ করলাম।

"মিষ্টার ফিলিপ জোসেফ,

ওয়াহিয়া, ইণ্ডিয়ানা

প্রিয় মিষ্টার জোসেফ,

কোম্পানী রেডিওর জগতে তার নেতৃত্ব বজায় রাখতে চায়।

(আরে মশাই, আপনার কোম্পানী কি চাইল না চাইল তাতে আমার কি যায় আসে? আমি মরছি নিজের জ্বালায়, ব্যাঙ্কের কাছে বাড়ীটা বন্ধক দেওয়া আছে, স্টক মার্কেটে শেয়ারের দাম পড়ে গেছে, আটটা পনেরোয় ট্রেনটা ধরতে পারিনি। গ্লোরার নাচের আসরে

আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি, ডাক্তার বলেছে প্রেসার নাকি বেড়েই চলেছে)।

তারপর কি ঘটল ? হন্তদন্ত হয়ে অফিসে এলাম। চিঠি খুললাম। দেখলাম আপনার কোম্পানীর সৎ ইচ্ছার বাক্যকটি ! (বাঃ ! আপনি যদি শুধু একটু বুঝতেন যে এমন চিঠি পড়ে মনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে বিজ্ঞাপনের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ছাগল চড়াবার কাজ করতেন।)

"এই এজেন্সির কর্মধারা সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাই বছরের পর বছর ধরে আমরা রেডিও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান লাভ করে আসছি।"

(আপনার কোম্পানী মস্ত বড়, আপনি বিরাট ধনী, মাটিতে আপনার পা পড়ে না, তাতে কি এসে গেল। যদি জেনারেল মোটর, জেনারেল ইলেকট্রিক আর ইউ, এস আর্মির জেনারেল স্টাফদের একত্র করা হয় তাহলেও আমি ভয় পাই না। যদি উড়ন্ত পাখীর মগজে যেটুকু ঘিলু থাকে তা আপনার মাথায় থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন যে আপনি কত বড়। তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। আমি শুধু জানতে চাই যে আমি কত বড়। আপনার অবিশ্বাস্য সাফল্য সম্পর্কে এই সব গর্বিত উক্তি আমার ক্ষুদ্রতাকে প্রকাশ করছে।)

"আমরা রেডিও স্টেশনে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর কাজ করতে চাই।"

(আমরা চাই ! আমরা চাই, ওহে, মুর্খ গাধার দল, তুমি কি চাইছ বা মুসোলিনী কি চাইবেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। আমি কি চাই সেটাই হল শেষ কথা। তোমার চিঠিতে সে সম্পর্কে একটি শব্দও নেই !)

"আপনি আমাদের কোম্পানীর নামকে আপনার সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপন সংগ্রহকদের তালিকার শীর্ষে রাখতে পারেন।

(তালিকার শীর্ষে ? সে শক্তি তোমার আছে ! নিজের কোম্পানী

সম্পর্কে বড় বড় কথা বলার অভ্যেস না গেলে তোমার নাম আমি তালিকার মধ্যে ঢোকবই না।)

"এই চিঠির দ্রুত উত্তর পেলে উভয় পক্ষই উপকৃত হব।"

(ওহে মুর্খ! তুমি কি ভেবেছ বড় বড় কথা বলে বাজীমাত করবে? আমি আমার ব্লাড প্রেসার নিয়ে চিন্তিত। আর তুমি চিঠির দ্রুত জবাব চাইছ। তুমি কি জানো যে আমিও তোমার মত ব্যস্ত? অন্তত ব্যস্ততার ভান করি, তুমি কেন রাজার মত হুকুম দিচ্ছ? অবশ্য চিঠির একেবারে শেষে আমার কথা ভাববার চেষ্টা করেছ। তবে তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না।)

আপনার একান্ত
পার্ল স্মিথ
ম্যানেজার আকাশবানী
বিজ্ঞাপন বিভাগ

পুনশ্চ—চিঠির সঙ্গে ব্রড জার্নালের কপি পাঠালাম। আশা করি আপনি আপনার স্টেশন থেকে এর নির্বাচিত অংশটি প্রচার করবেন।

(অবশেষে তুমি পুনশ্চের মধ্যেও তোমার পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করেছ। এতে আমার কোন সমস্যার সমাধান হবে কি? বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সংযুক্ত যে লোক এমন চিঠি পাঠাতে পারে তার মেডুলা অবলংগাটাতে কোন গোলমাল আছে। তোমার উচিত এক শিশি আয়োডিন খেয়ে থাইরয়েড গ্লাণ্ড পরিস্কার করা।)

* * *

যে ভদ্রলোক বাণিজ্য বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত তিনি কি করে এমন চিঠি দিলেন? তাহলে আমরা কসাই অথবা ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে কি ধরনের সৌন্দর্য বোধ আশা করব?

প্রতিদিন আমরা ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ক্লান্ত শ্রান্ত সেলসম্যানদের দেখতে পাই। তারা অত্যন্ত কর্মহীন, নিরাশা এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত।

এর কারণ কী ?

অবশ্য একথা সত্যি যে ওরা সব সময় কাজ অনুযায়ী বেতন পায় না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চরম সত্যকে স্বীকার করতে হবে। কতৃপক্ষের কাছ থেকে উপযুক্ত উৎসাহ বা প্রশংসা লাভ না করায় ওদের ইচ্ছে শক্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়।

তারা খরিদ্দারদের মনোস্তাত্বিক ব্যাপারে এতই অনভিজ্ঞ থাকে যে নিজের কাজে সাফল্য আনতে পারে না।

মুখ বুজে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সত্যি। কিন্তু সেই পরিশ্রমের তুলনায় উপযুক্ত ফল লাভে ব্যর্থ হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল।

সেটা আমার ফেলে আসা দিনের গল্প, আমি তখন গ্রামে থাকতাম। দেখতাম এক বৃদ্ধ লোক দাঁতের মাজন বিক্রী করছেন। তাঁর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। কোন কাজে তিনি উৎসাহ পাচ্ছেন না। ভদ্রলোককে দেখে আমার খুব কষ্ট হত। তখন তো আমি ছিলাম নেহাতই বালক। তাই ভদ্রলোকের জন্য কিছুই করতে পারিনি।

পরবর্তী কালে আমি সেলসম্যানদের মনস্তত্ব নিয়ে প্রচুর বই পড়ি। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ইউলের দুটি সুন্দর বই আছে—সৌভাগ্যের পথ ও বিক্রয় বাড়ানোর উপায়।

আমার মনে হয় যে কোন তরুণ সেলসম্যান যদি মন দিয়ে এ দুটি বই পড়ে, তাহলে তাকে আর অসুবিধের মুখোমুখি হতে হবে না। অবশ্য অতিরিক্ত কর্মঠ হওয়ায় কয়েকটি সমস্যা আছে।

যেমন ধরুন ওয়াশিংটনের সেই বিখ্যাত চিকিৎসকের কথা। সহজ কারণেই তার নাম উল্লেখ করতে পারছি না। শুধু বলে রাখি চিকিৎসক হিসাবে তিনি যে বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন তা যে কোন মানুষের ঈর্ষার বিষয়। আমি একবার তার কাছে যাই আমার টনসিল দেখাতে।

কি আশ্চর্য! তাঁর সাজানো গোছানো চেম্বারে প্রবেশ করা মাত্রই

তিনি আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এবং আমার ব্যবসা নিয়ে এতই উৎসাহিত হলেন যে টনসিলের কথাটা বেমালুম ভুলে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কি করে আমার কাছ থেকে উপকার আদায় করা যায়। অথচ আমি তার কাছে সাহায্য চাইতে চাই।

এর ফলে কি হল ?

আমাদের কেউই অপরকে সাহায্য করতে পারলাম না এবং যে সম্পর্কটা হয়তো গড়ে উঠত তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।

আমি একবার উপযুক্ত কথা বলার ক্লাস শুরু করি।

সেই ক্লাসে যারা ভর্ত্তি হত তারা ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবিশ।

সেখানে আমার নানা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়, যা আজও স্মৃতির মণিকোঠায় জমা হয়ে আছে।

যেমন ধরুন সেই লাজুক ছেলেটি, তার নাম আমার মনে নেই, কিন্তু তার মুখ এখনও মনে আছে। তাকে আমি কিছুতেই কথা বলাতে পারিনি। অবশেষে একদিন হঠাৎ আবিস্কার করলাম যে ছেলেটি বাসকেট বল খেলতে খুবই ভালবাসে।

সেদিন ক্লাসে তাকে তার প্রিয় খেলার ওপর কিছু বলতে বলি।

সে প্রায় আধঘণ্টা ধরে বাসকেট বল সম্পর্কে গড় গড় করে বলে যায়।

ঐ ঘটনা আমার চোখে আঙুল দিয়ে এই সত্যটা দেখিয়ে দিল যে আমরা যদি মানুষের মনে অনুরাগের সঞ্চার করতে পারি তাহলে তার সফলতার মাত্রা অনেক বেড়ে যায়।

অধ্যাপক ক্রীষ্টেরমতে—শিক্ষকের প্রধান কাজ হল ছাত্রের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করা। আকাঙ্ক্ষা থেকেই চেতনার জন্ম হয়। চেতনা থেকে আসে শিক্ষার আকর্ষণ।

অবশ্য এই অনুরাগ বাড়ানোর ব্যাপারে কটি মৌলিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যেমন ধরুন, পল হয়তো কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ছেলেকে তারা মানুষের মত মানুষ করতে চায়। বাবা চাইছেন ছেলে যেন ইঞ্জিনীয়ার হয়। মায়ের ইচ্ছে ছেলে হবে সাহিত্যের অধ্যাপক।

এই নিয়ে বাধলো সংঘাত। ফলে ছেলের প্রতি কেউ আর মনোযোগ দিলেন না।

ছেলেটি ধীরে ধীরে অবহেলার মধ্যে বড় হতে লাগল। তার মনে জন্মাল হীনমন্যতা। সে মাথা তুলে দাঁড়াবার বিচিত্র শক্তি হারিয়ে ফেলল।

অথচ দেখুন ছেলেটিকে মানুষ করার জন্য তার বাবা অথবা মা কম চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেল।

শুধু পলই নয়, পলের মত এমন হাজার হাজার ছেলে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ তাদের কথা ভাববার সময় এসেছে। ছোট থেকে যদি আমরা শিশুদের ব্যক্তিত্বের সঞ্চার করতে পারি তাহলে তারা আত্মনির্ভরতার মধ্যে বেড়ে ওঠে। অনেক বাব মা ছোটদের তেমন গুরুত্ব দিতে চান না। এটা কিন্তু উচিত নয়।

ভবিষ্যতে যে যথার্থ পুরুষ অথবা মহিলা হিসাবে রূপে গড়ে উঠবে, যার কাছ থেকে সমাজ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে এবং যে ভবিষ্যত প্রজন্মের ভাল মন্দের জন্য দায়ী থাকবে, তাকে তো সঠিক ভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতেই হবে।

শুধু খরচ করলেই চলবে না, আদব কায়দা শেখানোই যথেষ্ট নয়, ছেলেরা যাতে আত্মনির্ভরতার পথে সঠিক পদক্ষেপ রাখতে পারে তা দেখতে হবে।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোধহয় একটু পরিস্কার হয় তাই না ?

কেনেথ হিথম্যান নামে এক টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ার তাঁর তিন বছরের

কন্যাকে নিয়ে দারুণ বিপদে পড়ে যান। মেয়েটি কিছুতেই সকালের খাবার খাবে না। অনুরোধ উপরোধ, ভয় দেখানো মৃদু প্রহার সব যখন ব্যর্থ হল তখন চিন্তিত বাবা এক মনস্তত্ব বিশারদের শরণাপন্ন হলেন।

ছোট মেয়েটি তার মাকে অনুসরণ করত। সে ভাবত সে যেন বয়স্ক হয়ে উঠেছে।

তার এই মানসিকতার কথা জেনে ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করলেন।

পরের দিন সকালে মেয়েটিকে বলা হল সে যেন নিজেই তার খাবার তৈরী করে।

মেয়েটি যখন কিচেনে বসে চামচে দিয়ে ফলের রস গুলছে তখন তার বাবা সেখানে উপস্থিত হলেন।

বাবাকে দেখে মেয়ে তো আহ্লাদে আটখানা। সে চীৎকার করে বলল – বাবা বাবা—এই দেখো আমি নিজেই আমার খাবার তৈরী করেছি।

সেদিন সকালে মেয়েটি নিজেই পুরো গ্লাস শেষ করল। তারপর থেকে সে কোনদিন এ ব্যাপারে কোন গোলমাল করে নি।

উইলিয়াম উইণ্টার নামে এক বিখ্যাত শিশু বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন—আত্মউপলব্ধি হল মানবিক সত্তার সবচেয়ে বড় দিক।

মনে রাখবেন···শৈশব অবস্থা থেকে ছেলেমেয়ের মনে ব্যক্তিত্বের সঞ্চার করুন। নাহলে তারা জীবনের বন্ধুর পথে একলা হাঁটবে।

একাদশ অধ্যায়

বন্ধুত্ব লাভের সহজ উপায়

জীবনে কি আপনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন ?

আপনার কি মনে হয় যে জীবনটা ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠছে ? আপনি কি ভাবেন যে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানাতে পারছেন না। তাহলে বুঝতে হবে আপনি বন্ধুহীন হয়ে পড়েছেন ?

আসুন দেখাযাক কি ভাবে আপনার এই একাকীত্বের যন্ত্রণা দূর করা যায়।

যদি বলি এই মুহূর্ত্ত থেকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিন তাহলে কি খুব অবাক হবেন ? কিন্তু বন্ধু'ত্ব লাভের উপায়টা কি ? কেউ কি তা বলতে পারে ? তাহলে সেই যাদুকরের কাছে যাই যে বন্ধুত্বের চাবি-কাঠির সন্ধান জানে।

কে সে ?

হয়তো কাল সকালে পথের ধারে তার সঙ্গে আপনার হঠাৎ দেখা হতে পারে। যখন আপনি তার কাছাকাছি আসবেন তখন সে আনন্দে গদগদ হয়ে লেজ নাড়তে থাকবে। যদি আপনি তার মাথা চাপড়ে আদর করেন তাহলে সে আপনার কোলে লাফিয়ে পড়বে আর হাবে-ভাবে দেখাবে যে আপনাকে সে কতটা ভালবাসে।

আপনি তো জানেন তার এই ভালবাসার ভঙ্গিমা আন্তরিক। কেননা সে আপনাকে কোন সম্পত্তির সন্ধান দেবে না। এমন কি আপনাকে বিয়ে করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তার নেই।

আপনার কি কখনও মনে হয় না যে এ পৃথিবীতে কুকুরই হল একমাত্র প্রাণী যার করার মত কিছু কাজ নেই। মুরগী ডিম দেয়, গরু দুধ দেয়, ক্যানাড়ি পাখী গান করে।

কিন্তু কুকুর, তার কি কাজ ? সে শুধু ভালবাসা দেয়।

যখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর তখন আমার বাবা একটা ছোট ফুটফুটে হলুদ ঝুঁটিয়ালা কুকুর ছানা কিনে আনেন। আমার ছোটবেলার দিনগুলোতে সে ছিল প্রিয় সঙ্গী।

বিকেল হতে না হতেই সে তার সুন্দর চোখ দুটো নিয়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াত আর আমার গলার সাড়া পেলে লাফিয়ে বেরিয়ে আসত। হয়তো আমি পাহাড় ভেঙ্গে বাড়ী ফিরছি। আমার চুলের ডগা দেখা মাত্রই সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

পাঁচ বছর ধরে সে ছিল আমার একান্ত আপনজন। তারপর এক দুঃখের আঁধার রাতে আমার সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ হয়।

সেই রাতটা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। সেদিন সে আমার দশ ফুটের মধ্যে বাজের আঘাতে মারা যায়। তার মৃত্যু আমার ছেলেবেলাকে বিষাদময় করে তুলে ছিল।

বন্ধুত্বের আসল ঠিকানা কি তা আমি জানি না। তবে একটা সঙ্কেত বলতে পারি। আমরা যদি অন্যের প্রতি নিজেদের আকর্ষিত করি তাহলে দুমাসে যে বন্ধুত্ব অর্জন করতে পারব তা হবে আমাদের অভাবিত। অপরদিকে যদি আমরা দুবছর ধরে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করি তাহলে যে বন্ধুত্ব পাওয়া যাবে তা হবে কাঁচের মত ঠুনকো।

পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ এই ভুল পথে পা বাড়িয়ে নিঃসঙ্গতার জ্বালা বুকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

কেননা আমরা কেউই অন্যের ব্যাপারে আকর্ষিত হই না। নিজেদের নিয়ে আমরা নিজেরা এতই ব্যস্ত যে অন্যের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে নাক গলাবার মত সময় নেই। সকালে দুপুরে সন্ধ্যেবেলায় এমন কি গভীর রাতে আমরা শুধু আমাদের কথাই ভাবতে থাকি।

একবার আমেরিকার এক বড় শহরের টেলিফোন কোম্পানী সুন্দর একটি সমীক্ষা চালিয়ে ছিল। টেলিফোন সংলাপে কোন শব্দটির

ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হয় তা বার করতে গিয়ে দেখা গেল যে "আমি" শব্দটির সবচেয়ে বেশী বার উচ্চারিত হয়েছে।

পাঁচশটি টেলিফোন সংলাপের মধ্যে আমি "শব্দটি" প্রায় চারহাজার বার শোনা যায়।

যখন আপনি আপনার ছবি আছে এমন একটি গ্রুপ ফটোর দিকে তাকান তখন প্রথমে আপনি কার ছবি দেখেন?

আশা করি এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে না।

আপনি কি মনে করছেন যে অন্যেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট?

তাহলে একটা নির্মম সত্য উচ্চারণ করি। যদি আজ রাতে আপনার মৃত্যু হয় তাহলে কজন লোক আপনার শেষ যাত্রার সঙ্গী হবেন?

জীবনের এই কঠিন বস্তুটাকে মেনে নিয়ে আসুন একসঙ্গে বলি— আমরা যদি অন্যের ব্যাপারে উৎসাহিত না হই তাহলে তারা কেন আমাদেব প্রতি আকর্ষিত হবে?

এটা কিন্তু খুব কাজের কথা।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা এমন অনেক উদাহরণ খুঁজে পাব সেখানে এই আমিত্ব ভয়ঙ্কর ভাবে কাজ করছে।

ভিয়েনার বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড অ্যাডলার একটা বই লিখেছেন। যার নাম হল "জীবনের অর্থ কি?"

তাতে তিনি মন্তব্য করেছেন—যে ব্যক্তি অন্যের ব্যাপারে উৎসাহী হয় না সে জীবনে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং অন্যের ক্ষতি সাধন করে। এই ধরনের মানুষরাই ব্যর্থতার জন্ম দেয়।

পথে যেতে যেতে হয়তো আপনারা শিলালিপিতে লেখা শোক গাঁথা দেখে থাকবেন। যেখানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় অজস্র স্তুতি বা অকারণ প্রশংসা। আমার তো মনে হয় তার বদলে যদি অ্যাডলারের মন্তব্যটি খোদিত হত তাহলে মানব সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হতে পারতো।

নেপোলিয়ান যে শুধু বীরত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তা নয়, জনপ্রিয়তা অর্জনের বিরলতম গুণগুলি তিনি বিস্ময়কর ভাবে আয়ত্ত করেন।

তাই প্রিয়তমা জোসেফাইনের সঙ্গে শেষ দেখা হবার সময় তিনি কাঁপা কণ্ঠে বললেন—জোসেফাইন এই পৃথিবীতে যত মানুষের জন্ম হয়েছে তাঁদের মধ্যে আমি বোধহয় সবচেয়ে সৌভাগ্যবান, কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার সান্নিধ্যে নিজেকে বিরলতম অহঙ্কারের অধিকারী বলে মনে করছি। কেননা এখন আমি একমাত্র তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি।

ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যে নেপোলিয়ান নাকি সংকটকালে নিজের ওপরে বিশ্বাস করতে পারতেন না।

বিখ্যাত মনোস্তত্ত্ববিদ পরলোকগত অ্যালফ্রেড অ্যাডলার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

তাঁর উক্তিটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—যে একক মানব সত্বা তার সঙ্গী সাথীদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে সে জীবনকে অকারণে জটিল ও সমস্যা সঙ্কুল করে তোলে। এই ধরনের মানুষদের কাছ থেকেই ব্যর্থতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

মনোস্তত্বের পাতায় পাতায় চোখ রাখলে আমরা অ্যাডলারের সুচিন্তিত মন্তব্যের প্রতিফলন দেখতে পাব। আমাদের উচিত নিজেদের বিষয় নিয়ে অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকা। যাতে অন্য কেউ আমাদের আচরণে ব্যাথা না পায়।

এবার আবার নিজের জীবনের গল্প বলি।

আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এমন ঘটনা কম ঘটেনি যেখানে আমি মানব চরিত্রের এই আশ্চর্য সুন্দর দিকটির দেখা পেয়েছি। আগেই বলেছি আমি ছিলাম আমেরিকার এক অতি অখ্যাত গ্রামের ছেলে। ছোটবেলা থেকে বিস্ময়কর ঘটনার সম্পর্কে অন্বেষণ করতাম। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই অনুসন্ধিৎসা ক্রমেই বেড়ে গেল। এবং ক্রমশঃ আমি পরিণত হলাম ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের নায়ক হিসাবে।

আমাদের জনপ্রিয় রাষ্ট্র প্রধানের জীবনে যে অবিশাস্য জনপ্রিয়তা

দেখা যায় তার অন্তরালে তাঁর জনসংযোগের বিশিষ্ট ক্ষমতা। তিনি যে শুধু ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ হিসাবে অনন্য ছিলেন তা নয়! মানব মনের আশ্চর্য সুন্দর রহস্যের নিপুণ যাদুকর হিসাবে অনায়াসে তাকে চিহ্নিত করা যায়।

আপনারা হয়তো ভাবছেন যে এতবড় দেশের রাষ্ট্র প্রধানের পদে যিনি আসীন হয়েছেন তার পক্ষেই এ ধরনের বিশিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু আমি তার উল্টো কথা বলবো। আমার মতে ইচ্ছে করলে আপনিও এই অসামান্যতা অর্জন করতে পারবেন। অবশ্য তার জন্য কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

আমাদের পরম প্রিয় প্রেসিডেন্টের বাস্তব সান্নিধ্যে যারা এসেছিলেন তারা সকলেই তাঁর চিত্তাকর্ষক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যান। উনি যখন কারো সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সেই সংলাপের মধ্যে মিশিয়ে দিতেন সৌজন্য মাখা ভদ্রতার ছোঁয়া। এর ফলে প্রতিপক্ষ একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত। সে বুঝতেই পারত যে কতবড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

যদি আমার মন্তব্য অনুসারে কাজ করেন তাহলে আমি আপনাদের এই পরামর্শই দেব।

শুধু মাত্র প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রেই যে এটা প্রযোজ্য তা নয়, মহাযুদ্ধের সময় যে সমস্ত যোদ্ধারা দেশের স্বার্থে জোর লড়াই করেছিল তাদের অনেকের মধ্যে এই গুণটি দেখা যায়।

কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

কয়েক বছর আগে আমি কলোম্বিয়া কলেজ অফ আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সের একটি শিক্ষাক্রম চালু করি। তার বিষয়বস্তু ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য চেতনার উন্মেষ ঘটানো। সেখানে যারা আমার সংস্পর্শে আসেন তাদের মধ্যে ক্যাথলিন নরিস, ফ্যানি হারসট, ইডাটারবেল, অ্যালবার্ট টারজুন, রুপার্ট হিউগার্স প্রভৃতি উঠতি শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা ছিলেন। তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণ-রঙীন

অনুভূতির বর্ণালী ছটায় আমার মনের আকাশকে উষা প্রহরের রঙে রাঙিয়ে দেন। পরবর্তী কালে আমরা তাদের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে চলি এবং নিয়মিত পত্র যোগাযোগের ফলে অনেক অকথিত কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে।

যারা রুক্ষ কঠিন জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে সাফল্যতার কুসুম বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পা রেখেছেন, তাদের অভিজ্ঞতার আলাদা মূল্য আছে বৈকি।

যদিও জীবন দর্শন অথবা প্রকাশ ভঙ্গির দিক থেকে তারা ছিলেন ভিন্ন লোকের বাসিন্দা। কিন্তু সফলতার পথ পরিক্রমায় তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। তারা সবাই জনসংযোগের গোপন উপায়টি জানতেন, তাই আমাকে শ্বেত সহস্র পাপড়ির মত মেলে ধরেন।

রুজভেল্টের মন্ত্রিসভার অন্যতম সেক্রেটারী লেসলি এমার্স-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ওঁনাকে আমি আমার শিক্ষা-ক্রমে আমন্ত্রিত অধ্যাপক রূপে পেয়ে যথেষ্ট গর্বিত হয়েছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উনি যে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়ে ছিলেন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল ওঁনার বিশিষ্টতা, যা সচ্ছ জলের মত ত্রুটিহীন।

লেসলি ছাড়া আরো অনেক বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিসত্বার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আমার জীবন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই তালিকায় আছেন—থাপট্ মন্ত্রিসভার অ্যাটর্নি জেনারেল জর্জ ডব্লিউ উইকার অ্যাম, উইলিয়াম জেনিংস, প্রিয়াষ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট এবং আরও অনেকে।

এদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফলে আমি সরলতার যে ঠিকানা পেয়েছিলাম তা জনসংযোগের পথে পা রেখে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে আত্ম সচেতনতার মধ্যে।

এবার ইতিহাস থেকে একটি আলোড়িত ঘটনা তুলে নিলাম। একবার স্মরণ করুন জার্মান দেশের কাইজারের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তাকে পৃথিবীর ঘৃন্যতম সত্বা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার প্রতি বর্ষিত হয়েছিল অসংখ্য মানুষের অন্তরের বিপুল ঘৃণা। এমন কি তার

নিজের দেশের অধিবাসীরা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে জ্বেলেছিল বিদ্রোহের বহ্নি। এর ফলে তাকে প্রাণভয়ে হল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে হয়।

কাইজারের প্রতি উদ্গত ঘৃণার প্রাবল্য এত বেশী ছিল যে যদি তা অগ্নিতে রূপান্তরিত হত, তাহলে গোটা জার্মান দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এত মানুষের সমবেত ঘৃণা ও অপমানের মধ্যে একটি ছোট ছেলে কাইজারকে এক অদ্ভুত চিঠি পাঠায়। সেই চিঠির মধ্যে সে নির্বাসিত সম্রাটের প্রতি উজাড় করে দেয় তার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা। ছেলেটি রাজনীতির ছলাকলা জানে না। কাইজার তার দেশবাসীর প্রতি কি অবিচার করেছে সে খবর তার অজানা। সে শুধু শিশু সুলভ সরলতায় কাইজারকে সম্বোধন করে চিঠি পাঠিয়েছিল।

কাইজার তার চিঠি পড়ে এত মুগ্ধ হয়ে যান যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে ডেকে পাঠান। হয়তো নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঐ ছেলেটির পাঠানো চিঠি কাইজারকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিল।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কেন না ছেলেটি কাইজারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর তাদের জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়।

কয়েক মাসের মধ্যে তার মাকে কাইজার বিবাহ করেন। জার্মান সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ছোট্ট ছেলেটিকে কোন বই পড়তে হয়নি। এর থেকে কি বলা যায় না আমরা জন্ম থেকেই সৎ সুন্দর ও শোভন জীবনের অভিলাষী?

হয়তো অভিজ্ঞতার তিক্ততা আর বাস্তব জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা, আমাদের শৈশবী মনের শান্ত সূক্ষ্ম কারুকাজকে দলিত করে দেয়।

যদি বন্ধুত্বের বৃত্ত বাড়াতে হয় তা হলে সুস্থভাবের পরিধি বিস্তার করতে হবে। হতে হবে কর্মঠ, স্বার্থহীন এবং ভাবুক। না হলে অন্যের চরিত্রকে আকর্ষণ করার মত কোন গুণই আমাদের থাকবে না। একবার ডিউক অফ উইণ্ডসর ওয়েলসের যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত হন। তারপর তিনি দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করবেন বলে স্থির করেন। এর

আগে কয়েক মাস ধরে কঠোর অধ্যবসায়ে স্পেনীয় ভাষা রপ্ত করে নেন। যেহেতু ল্যাটিন দেশের সাধারণ মানুষ এই ভাষায় কথা বলে তাই যুবরাজ অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাদের মুখের ভাষা শিখে নেন। যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাবনার আদান প্রদানে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।

এর ফলে ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসীরা যুবরাজকে ভালবেসে ফেলে এবং ঐ দেশ ছেড়ে চলে আসার অনেক-অনেক দিন বাদেও তিনি ওদেশের জনমানস থেকে মুছে যাননি।

* * * *

কয়েক বছর ধরে আমি একটা চিত্তাকর্ষক গবেষনায় মেতে আছি। আপনারা হয়তো জানেন যে আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী নই। তবু জ্যোতিষ শাস্ত্রের কয়েকটি বিষয়ে আমার সহজাত আকর্ষণ আছে। এর মধ্যে একটি হল জন্ম তারিখের সঙ্গে ভাগ্যের সম্পর্ক। এখনও আমি সঠিক ভাবে জানিনা যে জন্ম লগ্নর সঙ্গে জাতক বা জাতিকার ভাগ্য কতখানি জড়িয়ে আছে, এ বিষয়ে আমি এক অক্লান্ত পরিশ্রমী ছাত্র।

তবে এই পদ্ধতিতে আমি বিপুল সংখ্যক মানুষের আন্তরিক ভালবাসা লাভের অপূর্ব এক মাধ্যম বের করেছি।

আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্গে জনপ্রিয়তার কি দুরূহ সম্পর্ক থাকতে পারে, তাই না?

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলা যাক।

যখনই আমার সঙ্গে কারোর দেখা হয়। তখন আমি তার জন্ম তারিখটা জেনে নেবার চেষ্টা করি। সদ্য পরিচিতর ক্ষেত্রে আমি এইভাবে প্রশ্ন করি—আচ্ছা বলুন তো, আপনার কি মনে হয় যে জন্ম লগ্নের সঙ্গে ভাগ্যের কোন সম্পর্ক আছে?

হয় সে আমার কথা শুনে অতি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠে অথবা আমাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়। তা যাই হোক তাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

ধীরে ধীরে গল্প জমে উঠলে আমি সুকৌশলে তার জন্মদিনটি জেনে নিই, এবং সেটি বার বার মনে মনে উচ্চারণ করি। যাতে ভুল না হয়।

হয়তো কেউ বললো যে সতেরই ডিসেম্বর তার জন্মদিন অথবা সে জন্মেছে ১০ই অক্টোবর। ধরা যাক ডিসেম্বরে জাত-ব্যাক্তিটি হল এক রাশভারী চেহারার শিল্পপতি, যিনি অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে জীবনের দিনগুলো কাটাচ্ছেন। মনে করি অকটোবরের জাতোঃ তরুণীটি যথেষ্ট সুন্দর এবং ঈষৎ লাজুক স্বভাবের। হয়তো সে কোন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেনীর ছাত্রী। অবসর সময়ে ছবি আঁকে, বেহালা বাজায়, কবিতা আবৃত্তি করার চেষ্টা করে।

এখন যদি সতেরই ডিসেম্বরের শীতের সকালে ঐ ভারীক্কি চেহারার গম্ভীর প্রকৃতির শিল্পপতির কাছে একটি শুভেস্চা বাণী এসে পৌঁছায় তাহলে তার মনের অবস্থা কি হবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন।

আবার যদি অকটোবরের শান্ত সমাহিত শারদ সন্ধ্যায় ভাবুক মেয়েটির বাড়ীতে বেজে ওঠে কলিং বেল, ডাক পিয়ন এসে একগোছা ফুটন্ত গোলাপের সাথে তুলে দেয় সুদৃশ্য রঙীন একটি শুভেচ্ছা পত্র তাহলে সে কি একবারও স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্যে আমার কথা ভাববে না ?

এই মজার খেলায় মেতে উঠে আমি কয়েকটা নতুন সত্যকে আবিষ্কার করেছি। প্রথমত, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই তার জন্ম দিনটিকে বিশিষ্ট একটি দিন হিসাবে মনে করেন। এটা তার একক সত্বার বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ জন্মদিনের সকালে কোন শুভেস্চা পত্র এলে তারা অতি মাত্রায় দূর্বল হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে পত্র প্রেরক তাদের একান্ত প্রিয়জন। এমন ভাবে গড়ে ওঠে সুমধুর সখ্যতা।

কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে সম্ভাষণের মধ্যে চেষ্টা ও তারুণ্য আনতে হবে।

মনে করুন শীতের সকালে টেলিফোন যন্ত্রের শব্দে আপনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রিসিভার তুলতেই কানে ভেসে এল এক অচেনা গলা। তখন যদি আপনার ঘুম ভাঙা রাগের ঝাঁপটুকু টেলিফোনের মধ্যে ঢেলে দেন তাহলে জনপ্রিয়তার স্রোত স্তব্ধ হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন টেলিফোন হল সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার অন্যতম জীবন্ত উপাদান।

টেলিফোন অপারেটাররা যাতে তাদের সংলাপের মধ্যে যথেষ্ট কমনীয়তা ও আন্তরীকতার ছোঁয়া রাখতে পারে তার জন্য নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানী একটি মনোরম শিক্ষাক্রম চালু করেছিল। সাধারণতঃ টেলিফোন অপারেটাররা গ্রাহক বা গ্রাহিকার কাছ থেকে তার ঈপ্সিত সংখ্যাটা জানতে চায়।

এক্ষেত্রে বেশী কথা বলার সুযোগ নেই। তাই যত সম্ভব কম কথা বলার মাধ্যমে হৃদয়ের সমস্ত সুপ্ত অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই কৌশল শিখে নেওয়া।

দেখা যাক আগামীকাল সকালে যে ফোনের শব্দে আপনার ঘুম ভাঙবে সেখানে আপনি এই কথাটি মনে রাখতে পারেন কি না?

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কি এই কথাটি প্রযোজ্য ?

আসুন, দুটি উদাহরণের সাহায্যে আমার উক্তির সত্যতা নিরূপন করা যাক।

ক্যালিফোর্নিয়া শহরের এক বিরাট ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর জন স্টুয়ার্ড একবার কোন একটি কোম্পানী সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট নিচ্ছিলেন। তিনি এমন একজন মানুষের নাম জানতেন যার কাছে ঐ সংস্থার সমস্ত গোপন রিপোর্টের চাবিকাঠি আছে।

জন স্টুয়াড ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

যখন তিনি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন তখন এক তরুণী মেয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দেয় এবং মাথা নেড়ে বলে যে কিছু দেবার মত সাধ্য তার হাতে নেই।

সে চলে যাবার পর ভদ্রলোক জন স্টুয়ার্ড বলেন—আমি আমার দুবছরের ছোট ছেলের জন্য ডাক টিকিট সংগ্রহ করি।

এরপর শুরু হল জন ষ্টুয়ার্ডের আলোচনা। তিনি একের পর এক প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ভদ্রলোক কোন প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারলেন না। কোন কারণে তাঁর মন এত বেশী বিক্ষিপ্ত ছিল যে তিনি সংক্ষিপ্ততার মধ্যে আলোচনা শেষ করলেন।

এই সাক্ষাৎকারের অন্তিম পরিণতি ব্যর্থতায় ভরে গেল।

জন স্টুয়ার্ড মনে মনে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। কেননা রিপোর্ট জমা দেবার শেষ দিন বিশেষ দূরে নয়? এর মধ্যে তাঁকে সমস্ত গোপন খবর সংগ্রহ করতেই হবে।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ঐ ষ্ট্যাম্পের কথা। তিনি যে ব্যাঙ্কে চাকরি করেন সেই ব্যাঙ্কের বৈদেশিক বিভাগে হাজার হাজার চিঠি এসে পৌঁছায়। সে সমস্ত চিঠির ওপর নানা ধরণের ডাকটিকিট মারা থাকে।

পরের দিন জন স্টুয়ার্ড আবার ঐ বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেক্রেটারীর মাধ্যমে খবর পাঠালেন যে তাঁর ছোট্ট ছেলের জন্য তিনি কিছু ডাকটিকিট নিয়ে যাচ্ছেন। এই খবর শুনে ঐ ভদ্রলোকের মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। এবং উনি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যান।

তিনি এত বেশী অভিভূত হয়ে পড়েন যে ঐ কোম্পানী সম্পর্কে সমস্ত খবর জানিয়ে দেন। ছোট্ট একটি ঘটনা যে মানুষের মনকে কতখানি আকর্ষিত করতে পারে এ হল তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

শুধু খবরই নয়। তিনি কথায় কথায় ঐ কোম্পানীর অনেক ভেতরের গুপ্ত তথ্য ফাঁস করে দেন। এতে জন স্টুয়ার্ডের কাজের জটিলতা অনেক কমে যায় এবং তিনি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাঁর রিপোর্ট দাখিল করতে সমর্থ হন।

আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমি আমার কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটাবো।

মিশিগান স্টেটের চেম্বারলিন নামে জনৈক ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে কয়লাশিল্পের ব্যাপক বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান করছিলেন। তিনি এক মস্ত বড় বিভাগীয় বিপণীকে কয়লা সরবরাহ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ঐ বিপনী শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এক উৎপাদকের কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে কয়লা কিনতো।

অবশেষে উনি আমার শরণাপন্ন হলেন। আমি চেম্বারলিনকে কিছু বুদ্ধি দিলাম। আমি বললাম যে যদি সহজ পথে কাজ না হয় তাহলে বাঁকা পথে এগোতে হবে।

আমার কথামত উনি ঐ বিপনীর মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন--আমি এখানে কোন কিছু বিক্রির জন্য আসিনি। আমি অন্য একটা কাজে এসেছি। আপনার সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য জানতে চাই।

তার কথা শুনে মালিক প্রথমে তাকে বিশেষ আমল দিতে চান নি। কিন্তু যেই চেম্বারলিন ফিস ফিস করে বললেন—আপনার বিপনী সম্পর্কে অনেক গোপন খবর আমার কাছে আছে সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোক তাকে আসন গ্রহণ করতে বললেন এবং ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ধরে তার সঙ্গে কথা বললেন। এই ঘটনা থেকে আমার বক্তব্যের সত্যতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

লোকের মন জয়ের গোপন পথ

নিউইয়র্কের ৮০ নং রাস্তার ধারে ৫ নং এভিনিউতে যে পোষ্ট অফিসটা দেখা যাবে সেখানে একদিন চিঠিফেলার সময় আপেক্ষমান জনতার মধ্যে কাউন্টারে বসে থাকা এমন একজন হতাশদীপ্ত বিমর্ষচিত্ত কেরানী আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল, যিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমীর মধ্যে একটুখানি শান্তির আলো জ্বেলে দেবার জন্য আমি প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ হলাম। কারনটাও আমার কাছে তেমন জটিল বলে মনে হোল না, কেননা যে কোন বস্তুর মধ্যেই অদৃশ্য আনন্দের উৎসকে খুঁজে বার করাই হোল আমার চিরাচরিত স্বভাব বৈশিষ্ট্য। —মহাশয় আপনার চুলগুলো সত্যিই ঈর্ষার যোগ্য। যদিও এর ঔজ্বল্য আংশিক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি যে এর আকর্যণী শক্তি এখনও ঈর্যার কারণ হতে পারে।

মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন ভদ্রলোক। কেননা আমি দেখলাম ওর মুখে একটা স্পষ্ট স্মিত হাসির ইষৎবর্ণময় প্রকাশ। অল্প একটু মুখটা তুলে নম্রমুখে জানালেন, ধন্যবাদ। 'অনেকেই আপনাকে এই ধরনের কথা বলেন' সবশেষে আনন্দ সহকারে জানালেন তিনি আমায়।

একটা অজানা গোপন আনন্দে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। কেননা আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিলাম যে আমার এই অকৃত্রিম প্রশংসা-বাক্য ওকে ক্লান্তিকর একঘেয়েমীর মধ্য থেকে মুক্ত করে কর্মজীবন এবং গৃহজীবনকে মধুর করে তুলবে।

পরবর্তীকালে জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি এর জন্য কি পেয়েছিলেন? এই কথাটা আমার মনে ভীষণ রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ভাবলাম, যদি আমাদের আত্মা এতই ঘৃণ্য

রকমের স্বার্থপর হয় যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা অপরকে একটু-করে আনন্দ দান করতেও অস্বীকৃত হই তাহলে পরিত্যক্ত টুকু বুকে নিয়ে আপনার মতোই আমার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে বঞ্চিত করব। আমাদের আর্থিক উদ্ধত্যের ভাঁড়ারে শুধুই শ্রমঅপচয় হবে।

আমি যা আশা করেছিলাম এবং যা পেয়েও ছিলাম, জাগতিক অর্থের মানদণ্ডে তাঁর সঠিক মূল্য নির্ধারন করা যায় না। যার পরিশোধ দেওয়াও তাঁর পক্ষে কোনদিনও সম্ভবপর হবে না। এই অপার্থিব অননুভূত আনন্দের মাধ্যম হয়ত মহাকাশের হাতে একদিন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে কিন্তু এর ফলশ্রুতি দীর্ঘজীবনের প্রাজ্ঞতা নিয়ে ব্যক্তির জীবনকে অমরত্বলাভের অধিকার করবে। মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয় সর্তই হোল এই। এর অন্যথা আমাদের জীবনকে বিঘ্ন সংকুল করে তুলবে ও অ-সভ্যতার বেদনা আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা থেকে ভ্রষ্ট করবে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত অধ্যাপকদ্বয় মিঃ ম্যাকবর্ণ ও মি ওয়ালটারের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, "মানুষের জীবনের সবথেকে আকাঙ্খিত বিষয় হলো নিজেকে অপবের চোখে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা।" এবং মানুষের এই মনোভাবই তাকে ইতরজীব থেকে আলাদা করে রেখেছে। এবং তাকে নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে রেখেছে।

হাজার দুহাজার বছর ধরে দার্শনিকেরা মানুষেব মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের এই সুপ্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ নীতির গবেষণা করে আসছেন। আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে পারস্য দেশে জোরামটার, খৃ-পূঃ ১৪ শতক আগে চীনে কনঘসিয়াম্‌, হ্যান উপত্যকায় নাওয়েৎমে, খৃ-পূঃ পঞ্চম শতকে বুলদিব এবং ভারতবর্ষের ধর্মীয় পুস্তকে এই কথাই বার বার উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে। যীশুখ্রীষ্টের সেই বিখ্যাত উক্তি, "তুমি তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে নিজের মতোই সহৃদয় ব্যবহার করবে।" এই অতি প্রয়োজনীয় সততাবাণীও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার।

বস্তুত নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তোমার একটা সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, তোমরাও এই ছোট্ট পৃথিবীতে কিছু দেওয়া প্রয়োজন। চালমি স্কোয়ার যে কথা বলেছেন, সেকথা মনে করে বাইরের স্থূল প্রশংসাবাক্যে না ভুলে প্রয়োজনীয় জিনিষটা গ্রহণ করে অপ্রয়োজনীয় জিনিষকে পরিত্যাগ করা দরকার। এইটিই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাম্য হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল আর একটি ঘটনা। সেদিন হেনরি মুভেলিমের অফিসটা জানার জন্য রেডিও সিটি পাহাড়ের অনুসন্ধান অফিসে গেছিলাম। পরিষ্কার পোষাক পরিহিত কেরানীটা মুখে একটা সবজান্তা ভাব দেখিয়ে ইতস্তত: করে জবাব দিল হেনরি মুভেলি ১৮ তলায় ১৮১৫ নং ঘরে থাকেন।

লিফ্‌টে ওঠার আগে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু জোরে বললাম, সত্যিই আপনার উত্তরদানের পদ্ধতি এমন যে একজন উল্লেখযোগ্য দক্ষ শিল্পীর মতোই অসাধারণ।"

আমার এই ছোট্ট কথাগুলো তার চোখে মুখে উজ্জ্বল আনন্দ ফুটিয়ে তুলল। তারপর সর্বদা অপরের প্রয়োজনীয়তাকে সবিশেষে গুরুত্ব দেবে। একটু আগের দেওয়া উজ্জল মুখের এই নির্ভুল অথচ দ্বিধান্বিত উত্তর দেওয়ায় কৈফিয়ৎ শুনে সেদিন বিকালে আমার গন্তব্যস্থলে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দে ভরে গেল। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে আর একটা সামান্য অভিজ্ঞতা জমা হোল।

এই দার্শনিক উপলব্ধির সম্মুখীন হতে গেলে মানুষকে সম্মানের উচ্চচূড়ায় না পৌঁছিলেও প্রাত্যহিক জীবনকে বৈচিত্রময় করে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে, যদি কোন পরিচারিকা আপনাকে আপনার প্রিয় জিনিস সার্ভ করতে ভুল করে তাহলেও তার সঙ্গে একটা সৌজন্যমূলক আচরণ করে তখন কোন ঝামেলার সম্মুখীন না হওয়া।

আমাদের এই পৃথিবীর মধ্যে এমন অনেক তোষামোদমূলক বাঁধাধরা

কথা আছে যা আমাদের কর্মক্লান্ত একঘেয়ে জীবনের মধ্যে নির্মল আনন্দের ছাপ আনে।

যদিও বাল্যকালে বাঁধাধরা শিক্ষালাভে তিনি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি তবুও হলকেইন, যিনি সামান্য কামারের ঘরে জন্মেছিলেন তিনিই পরিনত বয়সে অসামান্য সাহিত্যিকরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। যদিও খ্রীষ্টান, 'দি ডিমস্টার' ও 'দি ম্যান্‌কস্‌ম্যান' আজও সকলের কাছে আদরণীয়।

ছেলেবেলায় কবিতার প্রতি তিনি বেশী আকর্ষণ অনুভব করতেন। সে সময়েই একদিন তার লেখা কবিতার ওপর সমৃদ্ধ গোষ্ঠীর বিস্তর প্রশংসা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে। যথার্থ শিল্পী বুঝতে পেরেছিলেন সেইদিনকার সেই বালকটির চাপা পড়া প্রতিভা একদিন না একদিন তাকে অতুল গৌরবের অধিকারী করবে। তিনি বালকটিকে কাছে ডেকে নিলেন। তারপর থেকে তাঁর উৎসাহে ও আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে বালক হলকেইন হয়ে উঠলেন পৃথিবীখ্যাত উপন্যাসিক হলকেইন।

তাঁর বাসগৃহ, গ্রীবা ক্যাসল মনুষ্যসমাকীর্ণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আগন্তুকদের চোখে আকর্ষণীয় স্থান হয়ে ওঠে। আজীবন অতি সাধারণ জীবনযাপন করে তিনি মৃত্যুর পরে প্রভূত সম্পত্তি রেখে যান সাধারণ মানুষের জন্য। পৃথিবীর বহু ব্যক্তির চোখে নিজের আত্মস্বরূপ সম্পর্কে কোন প্রশংসাভাজন উক্তি না করে তিনি লোকের কাছে নিজেকে এখনও শক্তির উৎস করে করেছেন। বাস্তবিক' তিনি ছিলেন যথার্থইপ্রচারবিমুখ।

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মতোই তিনি নিজের গুরুত্ব কতোখানি ও তার স্বরূপটি বুঝতেন। ধরিত্রীর বুকে প্রত্যেক জাতিই সেরকম কামনা করে।

* * * *

পৃথিবীর মধ্যে জাপানীরা হচ্ছে সব থেকে উন্নত এবং রক্ষণশীল জাতি। এ সম্পর্কে তারা নিজেরাও বেশ সচেতন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ

হিন্দুরাই পৌত্তলিকতা এবং ছুঁৎমার্গীয় আচার আচরণের উর্দ্ধে উঠে উন্নত চিন্তার অধিকারী। আবার অন্যদিকে, কর্মপটু ও সুশৃঙ্খল এস্কিমো জাতি যারা 'সাদামানুষ' বলে তাদেরই জাতির একটা ঘৃণ্য অংশকে রীতিমত কলঙ্কস্বরূপ বলে মনে করে তাদের কর্মবিমুখতা এবং ছন্নছাড়া মনোভাবের জন্য।

অতএব এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, প্রত্যেক জাতির এই যুদ্ধবাজ প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব থেকে স্বদেশিকতা এবং যুদ্ধের জন্ম হয়।

প্রাত্যাহিক জীবনের পরিচিত ঘটনায় অহং মনোভাবাপন্ন লোকেরা এইভাবে একদিকে যেমন নিজের চিন্তার উন্নতি ঘটায় অন্যদিকে ব্যক্তি হিসাবে নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অপরকে উপলব্ধি করায়। "ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের কাছেই আমাদের কিছু না কিছু শিখবার আছে।" সমালোচকের এই মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রাত্যহিক পরিচিত এই সব মানুষেরা যাদের বিচারশক্তি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি তারা বাইরের চীৎকার এবং বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে নিজেদের গভীরতম অপর্যাপ্ত অনুভূতিগুলোকে সমর্থন করে যা আসলে ঘৃণ্য ও অপমানকর। শেক্সপীয়র বলেছিলেন "অহংমনোভাবাপন্ন মানুষেরা দৈবের মতোই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়।"

* * * *

তিনটে ঘটনার মধ্য দিয়ে এই অনুভূতিগুলোর উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি স্মরণ করা যেতে পারে।

সি. গিলবার্ন তার ওকালতি জীবনের প্রথমদিকে সস্ত্রীক আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে মোটরে চেপে লং আইল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তার স্ত্রী কর্তৃক ক্রুদ্ধা কাকীর কাছে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন খোশ গল্প করার জন্য। আলোচনার সময় তিনি এই অনুভূতি সম্পর্কে কথা বলতে বলতে বৃদ্ধা কাকীকে নতুন করে ফিরে পেয়েছিলেন।

—"বাড়িটা ১৮৯০ সালে তৈরী করা হয়েছিল তাই না ? আমার শৈশবের মতোই সুন্দর। প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললাম।

—কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েরা সুন্দর বড় বাড়ি অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ্যে ভরা ছোট্ট ঘরকেই স্বাগত জানায় আদরের সঙ্গে।

লক্ষ্য করলাম, নিজের ফেলে আসা উষ্ণ দিনগুলো স্মরণ করে তাঁর গলা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।" যদিও আমাদের বড়ো সম্পত্তি নেই, তবুও আমরা আমাদের ভালোবাসায় গড়া স্বপ্ন দিয়ে সুন্দর বাড়িটা তৈরী করেছিলাম।

তারপব তিনি একে একে তার দীর্ঘ জীবনের পথে সঞ্চিত মূল্যবান এবং তুর্লভ সামগ্রী দেখাতে লাগলেন এবং আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রশংসা ও বিস্ময় অর্জন করে নিতে লাগলেন।

"এরপর—মিঃ গিলবার্ণ বলে চললেন। "কাকী আমায় একটা নতুন প্যাকার গাড়ী দেখালেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কেনা স্বামীব এই গাড়িটা আমি তোমায় দেব, কেননা তুমি সুন্দর জিনিসের মর্য্যাদা দিতে জান।"

বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলাম, "আপনার মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই গাড়ীটা আপনি আমার মতো একজন অনাত্মীয়কে না দিয়ে নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়কে দিয়ে দিন। অথবা, সেকেণ্ডে হ্যাণ্ড বিক্রেতার কাছেও দিয়ে দিতে পারেন।"

—কখনো না—গলার স্বর ভারী হয়ে এল তাঁর।" আমার আত্মীয়েরা এই গাড়িটার জন্য আমারই মৃত্যুকামনা করে। আর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড লোকেদের কাছেও এটা আমি বিক্রী করতে পারব না কেননা, আমি দেখতে পারব না কিছুতেই যে আমারই স্বামীর কেনা গাড়ীটা অন্যলোকেরা ভোগ করছে। তাই আমার আত্মীয়রা বা তারা কিছুতেই পাবে না এই গাড়িটা, তোমার সৌন্দর্যরসিক মনই এই গাড়িটা প্রাপ্তির পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি।"

ওঁর করুণা ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে এই প্রস্তাব কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলাম না।

এই ছোট্ট কথার মধ্য দিয়েই অজান্তে বিরিয়ে গেল যে এই বিরাট সুন্দর মূল্যবান আসবাবে ভরা বাড়িটার একাকী এবং নিঃসঙ্গ ভরা তাঁর জীবন। যিনি একদা সুস্থ ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবনসম্পাদে অভ্যস্ত ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এই মরুভূমির মতো সহানুভূতিহীন নির্জন একাকী জীবনে আমার সহানুভূতিটুকু বসন্তের উষ্ণ বাতাস বহন করে আনল! যে অপরিসীম আনন্দকে ব্যক্ত করার জন্য তিনি প্রিয় প্যাকার গাড়িটা আমাকে দেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

* *

এরপর লুইস এবং ভ্যালেন্টিনের অধিকর্ত্তা, বাগানের মালিক এবং নিউইয়র্কের স্থ্যপতিবিদ মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের কথায় আসা যাক।" একদিন ওখানকার মালিক এলেন আমায় চারাগাছ রোপণের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিতে, আমি তখন সেইমাত্র একটা আকর্ষণীয় আলোচনা থেকে বিরত হয়েছি।

তখন আমি কথায় কথায় ওঁর কুকুর গুলোর প্রশংসা করলাম। আমার এই ছোট প্রশংসাবাক্যে উনি বিগলিত হয়ে পড়লেন। বললেন শুধু এই কুকুরগুলোই বিরাট প্রদর্শনীর বড়ো বড়ো পুরস্কার বিজয়ী নয় এর বাচ্চাগুলোও সমান আকর্ষণীয় এবং বুদ্ধিমান। আপনি কি দেখতে চান?

আমি কিছু বলার আগেই তিনি কুকুরগুলোর বংশতালিকা বের করে ফেললেন এবং মা কুকুরগুলোর সঙ্গে তাদের বাচ্চাগুলোকেও বার করে এনে দেখাতেও লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আপনার ঘরে কি কোন বাচ্চা আছে?

আমি কিছু না বুঝেই বললাম, হ্যাঁ আছে।

—সে-কি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে খেলা করতে ভলোবাসে? আমার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া দেখেই তিনি উৎসাহভরে বলে উঠলেন,

—আমি আপনাকে একটা খুব সুন্দর কুকুরছানা উপহার দেব। আপনার ছেলের খেলা করার জন্য। কেমন? তারপর তিনি আমায় ভালো করে বুঝিয়ে দিলের কুকুরের বাচ্চা কি খায় এবং এদের খাবার ধরণই বা কিরকম। কিন্তু তাতেও তিনি ঠিকমত শ্বস্তি পেলেন না। বাড়ী যাবার আগে আমি যাতে ভুলে না যাই সেজন্য নিজে বাড়ির ভিতর থেকে কাগজ কলম নিয়ে এসে সমস্তটা লিখে দিলেন। গাড়ীতে উঠতে উঠতে ভাবলাম, কতো সহজেই আমার ছোট্ট অকৃত্রিম প্রশংসাবাক্য একজন ভদ্রলোককে উদ্বুদ্ধ করে তার এ৭শডলার মুল্য সম্পন্ন কুকুরের বাচ্চা এবং ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট মূল্যবান সময় ব্যয় করাল। অতুল সম্পদ এবং কীর্ত্তির অধিকারী চলচ্চিত্র অধিকর্ত্তা জর্জ ইষ্টম্যান পর্যন্ত এই ছোট অনুভূতির জন্য লালায়িত ছিলেন।

কয়েক বছর আগে ইষ্টম্যান যখন মাতৃস্মৃতি স্মরণে রাষ্ট্রের একটি সঙ্গীতস্কুল এবং কিলবোর্ণ থিয়েটার হল নির্মাণ করতে মনস্থ করেন তখন নিউইয়র্কের সব থেকে বিখ্যাত চেয়ার সরবরাহকারি মি জোসেফ ঐ থিয়েটারে চেয়ার সরবরাহের জন্য স্থপতিবিদের সঙ্গে ফোনে সাক্ষাৎ করেন। স্থপতিবিদ বলেন আপনি ওঁর মূল্যবান সময়ের কথা মনে করে ওঁর সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে ইচ্ছা করলে করতে পারেন।

সন্তুষ্টমনে জোসেফ যখন মি. ইষ্টম্যানের অফিসে পৌঁছিলেন তখন মি. ইষ্টম্যান ডেস্কের ওপর ঝুঁকে ফাইল দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। ওকে দেখে তিনি চশমা খুলে টেবিলের ওপর রেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন, সুপ্রভাত, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলে জোসেফ জানালেন, যদিও তার কাঠের ব্যবসা আছে তবুও এমন সুন্দর কারুকার্য করা ঘর তিনি কখনও দেখেন নি, এরকম ঘরে কাজ করতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

এ ধরনের কথা শুনে ইষ্টম্যান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন, এই বাড়িটা তৈরী করার সময় আমি এই রকমই একটা ইচ্ছা অনুভব

করতাম। কিন্তু পরে বিভিন্ন কাজের চাপে পড়ে কখনও কখনও এই ঘরটায় আমি সপ্তাহে একবার আসতে পারি না।

—"এই দেওয়ালটা ইংলিশ ওক কাঠের তাই না?" বললেন মিঃ জোসেফ। হ্যাঁ। আমার এক বন্ধু যিনি কাঠের কাজে বেশ দক্ষ, তিনিই এটা তৈরী করে দিয়েছেন।

কথা বলতে বলতে ওরা জানালার ধারে চলে এসেছিলেন। সেখান থেকে রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ হাসপাতাল, বান্ধব সমিতি, শিশু চিকিৎসালয়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ইত্যাদি বড় প্রতিষ্ঠানগুলো দেখা যাচ্ছিল। মিঃ জোসেফ ইষ্টম্যানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন যখন শুনলেন যে ইষ্টম্যান সাধারণ মানুষকে ভালোবেসে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।" কথায় কথায় জর্জ ইষ্টম্যান জোসেফকে তাঁর আবিষ্কৃত বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এই অসাধারণ প্রতিভাধারী মানুষটির বাল্যজীবন কিভাবে কেটেছিল তা জিজ্ঞাসা করলে মিঃ ইষ্টম্যান কোন দ্বিধা না করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে লাগলেন, যে তাঁর বাবা মারা যাবার পর মা বোর্ডিং-এ তাকে ভর্তি করে দেন। সেখানে তিনি মাত্র ৫ সেন্টের কেরাণী পদে নিযুক্ত হন এবং মা ও ছেলের দুঃখ দূর করার জন্য উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন।

কোন কোন দিন অফিসে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা কাজ করেন, কখনও কখনও বা সমস্ত রাত্রি কাজের চাপে তিনি ঘুমোতেই পারেন নি—আবার এমনও কতদিন যায় যেদিন তিনি নিজের জামাকাপড়ের উপরেই একটানা ১২ ঘণ্টা ঘুমোতে থাকেন।

মাত্র পাঁচ মিনিটের অনুমতি নিয়ে তিনি আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এখন দুঘণ্টা হয়ে গেল আলোচনা তবু শেষ হোল না।

জোসেফের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন ইষ্টম্যান, বললেন গত বছর আমি জাপান থেকে তৈরী করে আনা চেয়ারগুলো দিয়ে আমার বারান্দাটা

সাজিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন বাদে যখন দেখা গেল প্রখর সূর্যালোকে ওদের রঙগুলো চটে যাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়ে নিজেই বাজার থেকে রঙ কিনে এনে স্বয়ং পালিশ করলাম। একটা প্রশস্ত কৌতুক তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমায় চেয়ারগুলোর দেখার জন্য লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানালেন।

খাওয়া দাওয়ার পর মি. ইষ্টম্যান যত্ন করে নিজের হাতে রঙকরা চেয়ারগুলোকে দেখালেন। জোকে বুঝতে পারছিলেন যে চেয়ারগুলো কম দামী হলেও তাঁর নিজের হাতে রঙ করা বলে মিঃ ইষ্টম্যান মনে মনে গর্বিত হয়ে পড়েছিলেন।

আর তারপর বাড়ী ফেরার পথে তিনি ৯০ ০০০ ডলারের দর্শনীয় অর্ডারটা দান করলেন এই নতুন বন্ধুটিকে এবং আজীবনের জন্য তাঁকে নিকটতম বন্ধু হিসাবে স্বীকৃতি জানালেন।

গৃহই হোল এই পরিকল্পনা প্রয়োগের একমাত্র এবং উপযুক্ত স্থান। সেখানে এই পরশমণির যাদুক্রিয়া সব থেকে ব্যর্থতা অথবা সব থেকে সাফল্য লাভ করতে পারে।

কয়েক বছর আগে নিউ বার্নসুউইকের মিয়ামিচ নদীর উৎস স্থল থেকে মাছ ধরার জন্য আমাকে কানাডিয়ার গভীরতম জঙ্গলের মধ্যে আস্তানা করতে হয়েছিল। এই সময় আমার নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল খবরের কাগজের অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ডায়াম ডিকেন্সের অমূল্য নিবন্ধাবলী। যার মধ্যে বিবাহের পূর্বে নবদম্পতিদের প্রতি মূল্যবান উপদেশ গ্রথিত ছিল।

এই পরশমণির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত কোন পুরুষের বিবাহ করা উচিত নয়। কেননা অপরকে সন্তুষ্ট করার এই মনোভাব তোমার প্রতি অনুরাগিনী মহিলাকে বিবাহের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার মূল অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিবাহের মধ্য দিয়ে মানুষ পরোক্ষ-ভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে। এটা হোল একটা রাজনৈতিক যুক্ত-কৌশল।

দাম্পত্য জীবনকে মধুর এবং অবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখতে গেলে কখনোই তার কার্যাবলীর সমালোচনা করা উচিত নয়। পরন্তু কথায় কথায় সঙ্গিনীর রূপ ও গুণগত প্রশংসা করতে হবে এবং হাসি গল্প ও মধুর ব্যবহার উপহার দিতে হবে। যদি তিনি রন্ধনপটীয়সী হন তাহলে দেখবে অচিরাৎ তোমার স্নেহস্পর্শে সে প্রাণপণে নিজেকে তোমার অভীষ্ট পথে চালিত করবে, এবং তোমার চোখে আদর্শগৃহিনী রূপে পরিগণিত হবে। এটা আচমকা প্রয়োগ না করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত। উষ্ণ সম্ভাষণ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ দান-প্রতিদান নর নারীর দাম্পত্য জীবনকে অত্যাবশ্যক চিরমধুর করে তোলে এবং কখনও তাকে নিঃসঙ্গতার শিকার হতে দেয় না।

তুমি কি জানতে চাও নারীর অন্তরের গোপন এবং গভীর রহস্য কি! এ সম্পর্কে হ্যানা ষ্টৌন-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।

একবার হ্যানা জেলের মধ্যে এমন একজন কয়েদীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যিনি বহুসংখ্যক নারীর অন্তরকে অতি সহজেই জয় করতে পেরেছিলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হ্যানা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার চরিত্রের এই রহস্যের গোপনতম চাবিকাঠিটি কি ধরনের, তখন মৃদু হেসে লোকটি উত্তর দিয়েছিল, "সেই রহস্যময় চাবিকাঠিটি হোল স্ত্রীলোকের সামনে তার গুণের প্রশংসা করা।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম কূটনীতিবিদ ডিজারলীও এই কৌশলটা যে কোন ব্যক্তি-তা সে পুরুষ অথবা রমণী যাই হোক, সকলের ওপরে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন।

এই সুবিশাল আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে যে,—

অপর ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

এই দীর্ঘ আলোচনাটা এখন সমাপ্তির পথে। এখন ওঠো এবং তোমার প্রিয়জনের ওপর এটা পরখ করে দেখ এবং অচিরাৎ এর উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতির ওপর আনন্দ উপভোগ করো।

*

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মন জয় করার সহজ উপায়

হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন থিওডোর রুজভেল্টের আকাঙ্খা ছিল যেহেতু তার জীবনের অর্ধেকের বেশী অংশ নির্ভুল সেহেতু তিনি যা চাইবেন তাই পেতে পারেন। বিংশ শতাব্দীর এই রকম একজন সম্মানিত ব্যাক্তির এই আকাঙ্খা আমাদের জীবনেও প্রশ্নের ঝড় তোলে।

যদি তুমি নিজেকে ৫৫% নির্ভুল বলে মনে কর তাহলে তুমি ওয়ালস্ট্রিটে গিয়ে স্বচ্ছন্দে - লাখ ডলার উপার্জন করে একজন গায়িকাকে সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতে পার। কিন্তু কোন মানুষকে তার বাইরের আবরণ থেকে ভুল বলে মনে করা উচিৎ নয়। কেননা, এটা তার ব্যক্তিসত্তার অপমান ঘটায়। ব্যক্তির এই অপমানিত সত্ত্বা তোমার শত্রু হয়ে অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়। যদি তুমি তোমার ব্যক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বৃথাই মানুষকে দার্শনিক কাণ্ট এবং প্লেটোর যুক্তি তর্কের প্রসঙ্গ আনো তাহলেও তুমি তার মনোভাবের কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। যেহেতু তুমি তার অনুভূতির ওপর আঘাত হেনেছ।

এ ধরনের মন্তব্য করা উচিতও নয় কেননা এর মধ্যে বক্তার একটা উদ্ধত অহমিকা প্রকাশিত হয় যা তার বক্তব্য রাখার আগেই শ্রোতার মনোভাবকে বিরূপ করে তোলে।

সুতরাং নির্বোধের মতো এধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না নেমে তোমার ব্যক্তব্যকে অতি সূক্ষ্ম এবং গোপনপথে শ্রোতার মনে প্রবেশ করান দরকার।

"মানুষকে শিক্ষা দিতে গেলে যেমন তা পরোক্ষে সম্পাদন করতে হয় তেমনি অজানিত বিষয়কেও চিরস্মরণীয় করে রাখার দরকার।"

২০ বছর আগে আমি গুণভাগের জটিল সমস্যার মতোই আইনষ্টাইন পাঠ করতাম। কিন্তু পরবর্ত্তী কুড়ি বছর আমি আমার বইতে কি লিখেছি তা ভালো করে জানি না।" সক্রেটিস বলেছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে আমি একটা কথাই ভালোভাবে জানি "যে আমি কিছুই জানি না।"

সক্রেটিসের মতোই আমি বলা ছেড়ে দিয়েছি যে-কোন মানুষ ভুল। আমি দেখেছি, এই আদর্শই পরে সকলের কাছে আকর্ষনীয় হয়েছে।

যদি আমরা প্রকৃত সত্যলাভের জন্য নিজেদের মতবাদটাই সম্পূর্ণ ও সার্থক না ভেবে একে অপরের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে হাত মেলাই তা হলেই আমারা ম্যাজিকের মতো প্রকৃত সত্য নিরূপণের সহজ পথ দেখতে পাব। এবং তাহলেই আমরা স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালের মধ্যে কোন বিরোধীতার সম্মুখীন হব না।

একদা একজন বিজ্ঞানী এবং পর্যটক স্টিভেনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনি এই উত্তর মেরুতে এগার বছর অতিক্রান্ত জীবনে, যার মধ্যে ছ বছর মাত্র মাংস ও মাছের ওপর নির্ভর করে সুস্থ গবেষণা শেষ করেছিলেন, তাতে আপনি কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন সেই অবিস্মরনীয় কথা, "বিজ্ঞানীরা যা সত্য তাকেই জানতে চায়, কোন কিছুর প্রমাণ করতে যাওয়া তাদের অভীষ্ট নয়।"

যদি তুমি স্বীকার কর যে তোমার ভুল হতেও পারে তাহলে তোমার এই স্বীকারোক্তি অপর মানুষকে সহজেই তোমার কাছে এনে দেবে। এবং তোমাদের আলোচনা হয়ে উঠবে সহজতর। এবং সে নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে সেও সবসময় ঠিক পথে যেতে পারে না।

কোন মানুষ, সে ভুল করছে একথা তাকে রুষ্টভাবে জানালে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্টের সামনে নিউইয়র্কের একজন নবীন উকিল একটা কেস সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। যার সঙ্গে বেশ কিছু টাকা এবং আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্তও জড়িত ছিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করেছিলেন মিঃ অ্যাডমিরালকে যে, আচ্ছা, নৌবহরের লিখিত আইনের সীমাবদ্ধতা কি ছ বছর ?

রুক্ষস্বরে অ্যাডমিরাল জানালেন, "না মহামান্য বিচারক। এর কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।"

ওর এই রুক্ষতায় সমস্ত আদালত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হে বিচারক আপনি ভুল বলেছেন, আমার এই অকৃত্রিম অথচ রূঢ় সত্যভাষণ তাঁর মতো বিচক্ষণ এবং পণ্ডিত মাননীয় জজের সম্মানকে আঘাত হেনেছিল। যদিও আমি জানতাম প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আইন আমার আনুকুলে; কিন্তু নৈতিকতার মানদণ্ডে আমি নিজের কাছে অপরাধী বিবেচিত হলাম।

পৃথিবীর মধ্যে কতকগুলো লোক যুক্তিবাদী, কেউ কেউ বা পুরানো নিয়মের পরিবর্তন কামনা করেন না, কেউ কেউ বা আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কেউ কেউ বা আবার ঈর্ষা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছাদিত কেউ আবার দেশকাল ও জাতি ধর্মের বাইরে মনটাকে বাড়াতে চায় না।

আমাদের মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে সর্বদাই কোন কারণ থাকে না। যদি আমরা নিজেদের বিশ্বাস গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অমনোযোগী এবং অপর মানুষের প্রতি কতকগুলো অবৈধ ধারণা পোষণ করে তাদের কাছ থেকে সরে আসার জন্য অপরের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হই তবুও আমরা স্বীকার করি না যে আমাদেরও ভুল হতে পারে। এ ধরনের স্বীকারোক্তির পরিবর্তে আমরা রেগে উঠি।

মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে আমিত্ব বোধের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এবং একে যথাযথ চিনতে পারার লোকই যথার্থ জ্ঞানের গুরু। আমি যার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি কেবলমাত্র তাকেই বিশ্বাস করি। আমাদের এই পরিচিত ও প্রচলিত ধারণার পথে চলতে গিয়ে কোন

বাধার সম্মুখীন হয়ে আমরা সংযম হারিয়ে ফেলি। এরমধ্য দিয়েই আমাদের মন পরিচিত বস্তু সম্পর্কিত আচরণের খুঁটিনাটির দিকে ধাবিত হয়। এর ফলশ্রুতি হোল আমাদের তথাকথিত বেশীরভাগ যুক্তিতর্কই আমরা সর্বদা যা করি তার বিশ্বাসের দ্বারাই গঠিত।

একদা একজন দর্জিকে আমি আমার গৃহসজ্জার জন্য নিযুক্ত করেছিলাম। রসিদ দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। আমার বান্ধবী মৃদু মন্তব্য করলেন, "আমি ভীত হয়ে পড়ছি তোমার এরকম নির্বুদ্ধিতা দেখে।" কিন্তু সাধারণ মানুষের মতোই আমি আমার নিজস্ব ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য একটু তর্ক করতে ছাড়লাম না। বললাম, কখনও কখনও এভাবে চলতে দেখা যায় যে যা সস্তা তাই সব থেকে দামী হয়ে যায় বাজারে আর যা দামী এবং সুন্দর তাই অবশেষে সস্তা হয়ে যায়। যা আপাতদৃষ্টিতে মানুষ আশাও করতে পারে না।

অন্য একজন বান্ধবী যখন কাপড়টির প্রশংসায় উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়ল এবং আমার রুচি ও সৌন্দর্যবোধের জন্য প্রশংসায় উচ্চমুখ হোল তখন আমার ব্যবহারের মধ্যে রীতিমত পরিবর্তন এল। মুখে দুঃখ ফুটিয়ে জানালাম, যে এর অত্যাধিক দাম আমাকে পরে ঐ দর্জি কাছে পরবর্তী পোষাকের জন্য নিয়ে যাবে না। এধরনের একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথাও জানালাম।

যদি আমরা কৌশলের সঙ্গে নম্রমুখে নিজেদের ভ্রান্তির কথা স্বীকার করি, তাহলে এর কারণটা অপরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উদারতার জন্য গর্ব অনুভব করি।

গৃহযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের ওপর হোরেস গ্রিলের মনোভাব এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। হোরেস চেয়েছিলেন জোর করে লিঙ্কনকে সপক্ষে আনবেন। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বুথ নামক জনৈক ইংরেজ লিঙ্কনকে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও এই সদাশয় পবিত্র ব্যক্তি তার এই ঘৃণ্য কাজকে কখনও সমর্থন জানান নি।

আবার মানুষের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে অথবা কিভাবে আত্মসংযমের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তারজন্য আমেরিকান ক্লাসিক সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের চিত্তাকর্ষক জীবনী গাথা স্মরণ করা যেতে পারে। এতে লেখা আছে কিভাবে তিনি তার দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলোকে সংযমের বাঁধনে বেঁধে ভবিষ্যতে রাজনীতির সুদক্ষ নেতায় পরিণত হতে পেরেছেন।

পূর্ণ যুবক বেঞ্জামিনকে একবার তার বন্ধু কতকগুলো কঠোর অথচ পূর্ণ সত্যসন্ধ উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বেঞ্জামিনকে সচেতন করিয়ে দিয়েছিলেন এই কথা বলে যে, তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা তার উপস্থিতিতে রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে। তিনি এও বলেছিলেন যে, এই সমস্ত উপদেশগুলোর প্রকৃত ফলশ্রুতি হোল কেবলমাত্র আমরা বর্তমান সম্পর্কেই জ্ঞাত হচ্ছি, যা আসলে জানার পথে কিছুই নয়।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মত মহৎ এবং উদার হৃদয় মানুষ এই রূঢ় অথচ সহানুভূতিমিশ্রিত তিরস্কার সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং শীঘ্রই তিনি তার পূর্বের উদ্ধত এবং গোঁড়া মনোভাব ত্যাগ করে নতুন পথের সন্ধানে অগ্রসর হলেন।

তিনি বলেছেন, এই ধরণের মনোভাব তাকে পরবর্তীকালে কোন নির্দিষ্ট মতামতের পথ পরিত্যাগ করে 'হয়তো' 'সাধারণতঃ' 'কল্পনাবশতঃ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারগত সুবিধা দেখায়। এমন কি যখন তিনি দেখেন অন্য লোকেরা ভুল পথে যাচ্ছে তখনও প্রত্যক্ষভাবে তিনি কোন তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে কৌশল করে অন্যপথে তাকে চালিত করেন। তিনি তখন তাকে বিনয়ের সঙ্গে বুঝিয়ে দেন যে বিপরীতপক্ষের বক্তব্যের অসম্ভাব্যতা কতোখানি। তার এই সহানুভূতিমিশ্রিত নম্র ব্যবহারের ফলশ্রুতিস্বরূপ শীঘ্রই শ্রোতার ওপর তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা পায়। এবং বক্তা ও শ্রোতার মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরূপ মনোভাবের অবসান ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক

বোঝাপড়া ঘটে। বেঞ্জামিন বলেছেন যে, যখন তিনি দেখেন যে অন্যপক্ষের লোকেরা ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করে সুপথে চালিত হয় তখনই তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মিশিয়ে দেন। ফ্র্যাঙ্কলিন এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

"এই ধরনের মনোভাব আমাকে আমার পুর্বেকার উদ্ধত এবং পক্ষপাতী মনোভাবের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে আমাকে স্বচ্ছন্দ ও অভ্যস্ত করে তুলে আলোচনার ধারাকে বাঁচিয়ে রাখে। আমার মনে হয়, আমার এই ধরনের ব্যবহার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে প্রতিবেশীদের কাছে আমার অস্তিত্বের সর্ব্বশেষ মূল্য এনে দেবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জনসভায় সম্মানজনক পদগ্রহণের স্বীকৃতি দেবে। যদিও বক্তা হিসাবে আমি খুব সুদক্ষ ও সপ্রতিভ নই তবুও আশা রাখি যে আমি কখনই কেন্দ্রবিচ্যুত হব না।"

নিউইয়র্কের যোশেফ এভিন্যুর ১৪ নং বাড়ীর অধিবাসী মিষ্টার এফ জে মেহনির ঘটনার কথাও এ প্রসঙ্গে মনে ভেসে যায়। তার কাছে একবার আইল্যাণ্ডের একজন তৈল ব্যবসায়ী কিছু সরঞ্জাম কেনার অর্ডার দেন। কিন্তু বন্ধুদের মুখে তিনি তখন শুনলেন ওগুলো জাল, তখন তিনি ফোনে মেহনিকে ডেকে যাচ্ছেতাই তিরস্কার করলেন। অর্ডার দেওয়া জিনিসগুলো নিতে অস্বীকৃত হলেন।

অফিসে মেহনিকে দেখে তিনি প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঘুষি পাকাতে লাগলেন। তার গলার স্বর অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে গেছিল। তিনি মেহনিকে তার জিনিসের জন্য দোষারোপ করতে লাগলেন এবং শেষে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন যে তিনি অর্ডার দেওয়া জিনিসগুলো আর কিনবেন না।

এবার মেহনির মুখে শুনুন।

"আমি কিন্তু একটুও ধৈর্য না হারিয়ে আস্তে করে বললাম, বেশ, আপনি যা বলবেন আমরা তাই করতে বাধ্য হলাম। এর দাম আপনি মিটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর জন্য আমরা সানন্দে আরও ২০০০ ডলার খরচ করব। কিন্তু আপনি যদি কেবলমাত্র আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী না চলে আমাদের ইচ্ছা বা পরিকল্পনানুযায়ী আপনার কর্ম-স্থানটিকে চালান তাহলে এর দায়িত্বও আমরা আমাদের ওপর নিতে পারবো।" তিনি শান্ত হলেন এবং আমাদের কথামত কাজ করলেন। এর পরের অর্ডারটাও আর ভুল হোল না এবং তারজন্য আমরা ঐ ঋতুতেই আরও দুটো মূল্যবান অর্ডার ওর কাছ থেকে লাভ করলাম। যদি আমরা এর বিপরীত আচরণ করতাম তাহলে এই অকারণ তর্কবিতর্ক থেকে আমরা আমাদের মূল্যবান খরিদ্দারকে হারিয়ে অর্থনৈতিক অপচয় ঘটিয়ে আইন সম্পর্কীয় একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করতাম। অতএব এ থেকে বোঝা যায় যে কোন মানুষকেই খোলাখুলিভাবে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন না করানো উচিত।

এবার নিউ ইয়র্কের কাষ্ঠব্যবসায়ী ষ্টিভেনসনের উদাহরণ স্মরণ করা যেতে পারে। তার চোখে কাষ্ঠ পরিদর্শকেরা বেসবল খেলার আম্পায়ারের মতো, অর্থাৎ তিনি মনে করতেন যে তারা একবার যার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতেন, আর কখনো তাকে পরিবর্তন করতেন না। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন এই ধরনের মনোভাব তার কারখানার প্রচুর ক্ষতি করছে তখন তিনি তার মনোভাবকে অন্যখাতে বইতে চেষ্টা করালেন।

একদিন সকাল বেলা তিনি তার অফিসে যখন বসে আছেন সেই সময় একজন ভদ্রলোক বিরক্তিকর এবং উত্তেজিত গলায় ফোনে জানালেন যে তার গুদাম থেকে মাল খালাস করার জন্য পরিদর্শকেরা অত্যন্ত বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। কারণ তাদের মতে, মিঃ স্টিভেনসন যে মাল সরবরাহ করেছেন সেগুলো তাদের নির্দিষ্ট নিয়মের নীতিবিরুদ্ধ। তিনি ষ্টিভেনসনকে জানাচ্ছেন তিনি যেন শীঘ্র এসে এর একটা ব্যবস্থা

করেন কেননা এর জন্য তার গুদামে মালগুলো সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি আমার অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম, পরিদর্শক নিশ্চয়ই কিছু ভুল করেছেন। তাই পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার জন্য শীঘ্রই গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যখন সেখানে পৌছলাম, তখন সেখানে প্রচণ্ড রকমের বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়ে গেছিল। আমি অনুরোধ করলাম তারা যেন আমার মালগুলো পুনরায় গাড়ীতে তোলা শুরু করে।

আমার অনুরোধমত পরিদর্শকেরা যখন জিনিসগুলো পুনঃপরীক্ষায় ব্যাস্ত ছিল তখনই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল আমার পূর্বের ধারণা কতদূর সত্য। কেননা, আমি বুঝতে পারলাম যে ঐ পরিদর্শকদের আমার প্রেরিত সাদা পাইন কাঠগুলোর সম্পর্কে খুব সামান্য অভিজ্ঞতাই আছে। আমি তাকে সোজাসুজি ভুল না বলে সহৃদয় বন্ধুত্বতাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলাম যে তুমি পরিদর্শকের ক্ষেত্রে ভুল করছ। আমি এমনভাবে বললাম যেন আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার পথ সুগম করার জন্য তাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছি। এর কারণ আমাদের মধ্যেকার বিরুদ্ধ মনোভাব পাল্টে যেতে লাগল। এবং উভয়ের মনে হোল যে উভয়ের কথার মধ্যেই আংশিক সত্য নিহিত আছে। আমি আমার ব্যক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে যাত্রার ক্ষেত্রে আপনার এতোই সচেতন ছিলাম।

আস্তে আস্তে তাঁর মনোভাব পাল্টে গেল। এবং তিনি স্বয়ং গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কৌতুহলী হয়ে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন এবং স্বীকার করলেন যে সাদা পাইনকাঠের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা অল্প। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি কোথায় ভুল করে ফেলেছেন এবং গাড়ীতে ওঠার আগে স্বীকার করলেন যে তার পূর্বের পরিত্যক্ত মালগুলির মধ্যে তার ভুলের জন্য অনেক ভালো মালও তিল হয়ে গেছে। যাবার আগে আমি দাড়িয়ে দেখতে পেলাম না

গাড়ীটা আবার ধীরে ধীরে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে এবং আমার হাতে একটা পরিপূর্ণ স্বীকৃতিপত্র এসে গেছে।

অপরকে ভ্রান্ত বলার এই ধরনের একটা ছোট্ট সংযমিত কৌশল আমাদের কোম্পানীর সুনাম এবং ১৫০ ডলার রক্ষা করল।

একটা প্রবাদ আছে যে, **অপরকে সোজাসুজি ভ্রান্তবলার আগে একটা ছোট্ট রাজনৈতিক চাল প্রয়োগ করবে।** খ্রীষ্টের জন্মের ২২০০ বছর আগে ইজিপ্টের রাজা আখতেই তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন সেই মূল্যবান কথাগুলো, 'রাজনীতিজ্ঞ হও, তাই তোমাকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

সুতরাং, অপরকে নিজের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করতে হলে মনে রাখতে হবে,

"অপরের মতামতকে সম্মান জানাবে এবং কখনও বলবে না যে সে ভ্রান্ত, তার ভুল হচ্ছে।"

চতুর্দশ অধ্যায়

চেতনার দিকে এগিয়ে চল

তোমার যুদ্ধং দেহি রুক্ষ মনোভাব তোমাকে তোমার মনোভাব প্রকাশের আনন্দ দিতে পারে কিন্তু অপর পক্ষ তাতে রীতিমত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হতে পারে। এটা তোমার জানা প্রয়োজন।

একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন, যদি কোন মানুষ তার প্রতিপক্ষের কাছে সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে নিজেদের দোষ ত্রুটি আলোচনা করে সংশোধনের প্রয়াসী হয় তাহলে তাদের এই সমস্ত সংযম জনিত মনোভাব পরস্পরকে কাছে আনার অনেক সুযোগ দেবে, অযথা গণ্ডগোল করার হাত থেকে রক্ষা করবে।

সমালোচকের এই উক্তির সত্যতা যে কতখানি তা আমেরিকার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সময় ম্যাকবর্ণ, যিনি জ্বালানি এবং লোহার কারখানার মালিক তিনি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই সময় এই কোম্পানীর শ্রমিকেরা বেশী মাইনের দাবীতে ধর্মঘট ডেকেছিল।

বহু হতাহত এবং রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যখন তিনি অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনলেন তখন তিনি চেষ্টা করলেন নিজস্ব মতামতের দ্বারা বিদ্রোহী শ্রমিকদের প্রভাবিত করতে। একদিন তিনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিকে ডাকলেন এবং তাদেরকে এমন কতকগুলো মূল্যবান উপদেশ দিলেন যাতে যন্ত্রচালিতের মতো বিদ্রোহীরা তাদের পূর্বেকার মনোভাব ভুলে গিয়ে ম্যাকবর্ণের উদ্দেশ্যে প্রচুর প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে লাগল। তারা ভুলে গেল যে পূর্বে এই তুচ্ছ কারনেই তারা একটা বিপুল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

ম্যাকবর্ণের এই সহৃদয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতামালা মরণোন্মুখ শ্রমিকদের কাছে ঔষধের মতো কাজ করেছিল। এই সমস্ত বক্তৃতামালায়

অনেক মূল্যবান শব্দ সম্পদ গাঁথা ছিল—যেগুলো যে কোন মানুষকে কাছে টেনে আনতে সাহায্য করে।

ম্যাকবর্ণ বলেছিলেন জনতার উদ্দেশ্যে, যে তিনি এই বিরাট কোম্পানীর অধিকর্তা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং শ্রমিকের সামনে আসার সৌভাগ্যলাভ করে গর্বিত। মাত্র দুসপ্তাহ আগে যিনি জনতার কাছে আগন্তুক হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি সাউদার্ণ কোলফিল্ড পরিদর্শন কালে এই সমস্ত বিদ্রোহীদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সকলের কাছে বন্ধু হিসাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি বললেন, আমি আপনাদের সঙ্গে সকলের স্বার্থজড়িত ব্যাপারে কথাবার্ত্তা বলে অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি আরও বললেন, যে তিনি সমবেত জনসাধারণের সামনে উপনীত হতে পেরে অশেষ আনন্দ অর্জন করেছেন। যদিও আমি সংরক্ষকদের প্রতিনিধি, তবুও আমি আপনাদের অনুগ্রহভাজন হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি

এটা কি শত্রুকে বন্দী করে ফেলার একটা সুন্দর কৌশল নয়? এর বিপরীত আচরণ যদি ম্যাকবর্ণের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেত অর্থাৎ তিনি যদি গায়ের জোরে অথবা গলার জোরে তাকে আপোষে আনার চেষ্টা করতেন তাহলে বিদ্রোহের আগুন তীব্র হোত ও ঘৃণার পরিমাণ বৃদ্ধি পেত।

এ থেকে একটা ছোট্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোন মানুষকে নিজের মতে আনতে গেলে গায়ের জোর ফলালেই হয় না কেননা মানুষ সহজেই পরিবর্ত্তিত হতে চায় না। বরং বন্ধুত্ব এবং সৎ ব্যবহারের দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে। প্রায় একশ বছর আগে লিঙ্কন একথাই বলে গেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কোন মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তোমাদের সহৃদয় ব্যবহার ফোঁটা মধুর মতোই আকর্ষণীয় মিষ্ট কাজ করবে।

Ford Motor Company-র শ্রমিকেরা যখন বিদ্রোহ করেছিলেন মাইনে বাড়ানোর দাবীতে তখন জেকব নামে একজন ব্যক্তি

তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের অলসতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বেসবল খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং শোনা যায়, এর জন্য নাকি তিনি একটা খেলার মাঠও ভাড়া করে ফেলেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জেকবের এই ব্যবহার নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত বন্ধুর জন্ম দেয়। সুতরাং বিদ্রোহীদেরও দেখা গেল তারা তাদের মাইনে বৃদ্ধি করার দাবার পথ মুলতুবি রেখে কোম্পানির মধ্যেকার পরিত্যক্ত ভাঙ্গা নোংরা উচ্ছিষ্ট বস্তু ঝেড়ে ফেলে তাদের কোম্পানীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ব্রতী হোল। ফলে শীঘ্রই কোম্পানীর সঙ্গে শ্রমিকদের বিদ্রোহের অবসান ঘটল এবং সে জায়গায় পূর্বেকার ঘৃণা ও দুষ্ট মনোভাবের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা পেল এক আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়া। সমগ্র আমেরিকার বিপুল শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি আর কখনও দেখা যায় নি।

বক্তা হিসাবে সুদক্ষ এবং তার্কিক হিসাবেও যিনি প্রচুর সুনামের অধিকারী সেই সৌম্যদর্শন ব্যারিষ্টার জোনস্ ও তার বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ লিঙ্কনকে টানার ক্ষেত্রে অপরের অনুমোদনের অপেক্ষা না করে যুক্তি তর্ক চালিয়ে যান। শান্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার তাকে অচিরেই সকলের কাছে বিখ্যাত হতে সাহায্য করেছিল।

একজন ইঞ্জিনীয়ার চার্লি স্ট্রেনার চেয়েছিলেন তার ইজারা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভাড়া করা বাড়ীতে আরও কিছুদিন কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। যদিও তিনি জানতেন যে তার মালিক অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক এবং তার কাছে কোন আবেদন নিবেদনের মূল্য নেই তবুও তিনি যা চেয়েছিলেন তিনি তা পেলেন না। উপরন্তু তিনি চাইলেন তার এতদিনের পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটাতে এবং তার জন্য তিনি বাড়ীর মালিককেই নির্বাচণ করলেন। ঘটনাটা চার্লির মুখে শুনুন।

—তারপর মালিক যখন তার সেক্রেটারীকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন দরজা থেকেই তাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে

ভেতরে আনলাম। তারপর অতি কৌশলে বাড়ীর ভাড়া সম্পর্কে কোন কথা না বলে বাড়ীর সৌন্দর্য এবং বাড়ীর মালিকের দৃষ্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলাম। বললাম, "আমার এখানে আরও কিছুকাল থাকার ইচ্ছা থাকলেও আমি এখানে থাকতে পারছিনা।"

আমার এই মধুর ব্যবহারে বাড়ীওয়ালা রীতিমত আনন্দিত হলেন। কেননা, তিনি জানালেন যে তিনি কখনও তার ভাড়াটেদের কাছ থেকে এরকম সহৃদয় ব্যবহার পান নি। তারা তাকে প্রকারান্তরে অপমানজনক কথাবার্তা বলেছে। এরপর তিনি আমার দিকে ঘুরে বসলেন এবং সানন্দে জানালেন যে আমার সঙ্গে তার এই প্রীতির সম্পর্ক যাতে একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে দীর্ঘ হয় সেজন্য তিনি বিনা প্রস্তাবেই ভাড়ার অঙ্কটা একটু খাটো করে দিলেন। বুঝলাম, যে আমি যদি তাঁর অন্যান্য ভাড়াটেদের মতোই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতাম তাহলে জয় আমার হাতের মুঠোয় এমন ভাবে ধরা নিত না।

* *

এবার অন্য আর একটা প্রসঙ্গে আসা যাক্। মিসেস এমিলি একবার তার বান্ধবীদের নিয়ে একটা হোটেলে মধ্যাহ্নকালীন আহারের আয়োজন করেছিলেন। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু মাটি হয়ে গেছিল আমার সহযোগী বান্ধবী এমিলির অনুপস্থিতিতে। তার প্রেরিত বেয়ারাটা জানত না কিভাবে একজন সম্মানিত অতিথিকে মর্যাদার সঙ্গে খাদ্য পরিবেশন করতে হয়। সুতরাং আমি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বান্ধবীদের বললাম, যাই, একবার এমিলির কাছে, তার সঙ্গে আমার জরুরী কথা বলে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর।

বুধবার নিজের এই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার আগে আমি "মানুষের এই ধরনের ব্যবহার একটা সঙ্গত কারণ" সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনেছিলাম।

যদিও আমি খুব কঠোর ও বদরাগী তা সত্ত্বেও আমি তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত হলাম আমার ভবিষ্যতের পথকে সহজ করে রাখার জন্য। আমি যখন এমিলির সম্মুখীন হলাম, বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় বললাম, দেখ এমিলি আমি জানি এ ব্যাপরে তোমার কোন হাত নেই এবং তোমার বেয়ারাও কালা।

আমার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে এমিলের আশঙ্কা দূর হোল। বলল, এর পরে আর কখনও এরকম ব্যাপার হবে না।

ফলে এর পরের আহারের ব্যবস্থাটা এতো সুন্দর হয়েছিল এবং খাবারগুলো এতো সুস্বাদু হয়েছিল এবং অভ্যর্থনাও এতো সুন্দর হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল আমারা কুইন মেরীকে অভ্যর্থনা করে আনছি। এমিলি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছুর তত্বাবধান করেছিল। চলে যাবার আগে আমার অতিথি আমাকে এই মেসের অভ্যর্থনার জন্য বার বার ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। সত্যিই আমি সেদিন এমিলির আন্তরিকতায় এবং বন্ধুজনোচিত মনোভাব দেখে খুবই তুষ্ঠ হয়েছিলাম।

বাল্যকালে স্কুল জীবনে পড়া বাতাস এবং সূর্য্যের শক্তি সম্পর্কে একটা প্রতিদ্বন্দী মনোভাবসম্পর্কীয় সুন্দর গল্প মনে পড়ে গেল। একদা দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগেছিল, কে বেশী শক্তিমান। তারা স্থির করেছিল পথিকের কোটটাকে কে আগে খুলতে পারবে—যে পারবে তারই শক্তি বেশী প্রমাণিত হবে।

সূর্য লুকিয়ে যাবার পর বাতাস বেগে বইতে লাগল। কিন্তু বোকা লোকটা শীতার্থ হয়ে গায়ের কোটটা ততোই জড়িয়ে ধরতে লাগল। তারপর বাতাস শান্ত হলে সূর্য্যের পরীক্ষা আরম্ভ হোল। সূর্য্য প্রবলবেগে কিরণ ছড়াতে লাগল, প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে লোকটি তাড়াতাড়ি গায়ের কোটটি খুলে ফেলল। তখন সূর্য্য বাতাসকে বলল, **ভদ্রতা এবং বন্ধুত্বতা জোর জবরদস্তি থেকে সর্বদাই শক্তিমান হয়ে থাকে।**

যীশু-খৃষ্টের জন্মের একশো বছর আগে রোমান কবি পাবলিয়াস সাইরাস বলে গেছেন—যখন অন্যের আমাদের প্রতি অনুরাগ হবে তখন আমরা তাদের প্রতি অনুরক্ত হতে পারবো।

তাহলে মনে রাখবেন—জনপ্রিয়তা বাড়াবার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই সত্যের মধ্যে যে নিজেকে নিমেষে অন্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

আশা করি আমাদের আলোচনা থেকে প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যার সার্থক সমাধান করতে পারবেন। শুধু কি তাই? তারা হয়তো ভবিষ্যত সুখী জীবনের সার্থক ও সুন্দর ছবি আকতে পারবেন। তাহলে সেটাই হবে আমার এ বই লেখার চরম সার্থকতা।